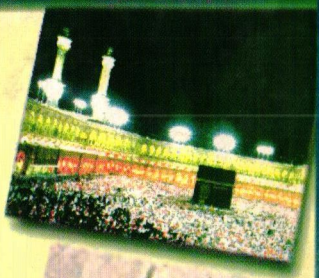
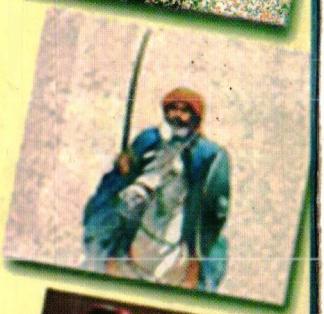
ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব

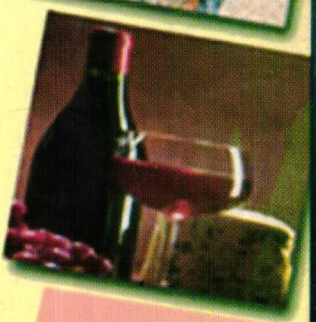
ডা. জাকির নায়েক



- বহু-বিবাহ
- একাধিক স্বামী
- 'হিজাব' বা নারীর পর্দা
- ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে
- মুসলমানরা মৌলবাদি এবং সন্ত্রাসী
- আমিষ খাদ্য গ্রহণ
- পশু জবাই দৃশ্যতঃ নির্দয়
- আমিষ খাদ্য মুসলমানদের উগ্র বানিয়ে ফেলে
- মুসলমানরা কা'বার পূজা করে









অনুবাদঃ মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব

ডাঃ জাকির নায়েক

পরিবেশনায়	প্রকাশক
খায়রুন প্রকাশনী	**নাকিব পাবলিকেশন্স**
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা) দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০ ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২-১০৯৪৬৭	৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি
বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব
ডাঃ জাকির নায়েক

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী ২০০৭
মহররম ঃ ১৪২৯
ফাল্গুন ঃ ১৪১৪

প্রকাশক ঃ
ফাতিমা শিরীন (নিঝু)
নাকিব পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
মাল্টি লিংক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

সূচী পত্র

১. বহু-বিবাহ

প্রশ্ন ঃ ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন ? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন ? / ১১

২. একাধিক স্বামী

প্রশ্ন ঃ একজন পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়, তাহলে ইসলাম একজন নারীকে কেন একাধিক স্বামী রাখতে নিষেধ করে ? / ১৬

৩. 'হিজাব' বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন ঃ ইসলাম পর্দার আড়ালে রেখে নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে ? / ১৮

৪. ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে ?

প্রশ্ন ঃ ইসলামকে কিভাবে শান্তির ধর্ম বলা যাবে যেখানে তা প্রচার ও প্রসার হয়েছে তলোয়ারের মাধ্যমে ? / ২৪

৫. মুসলমানরা মৌলবাদি এবং সন্ত্রাসী

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের অনেকেই মৌলবাদি ও সন্ত্রাসী কেন ? / ২৮

৬. আমিষ খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ একটি পশুকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। তাহলে মুসলমানরা কেন এতো পশু হত্যা করে, আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে। / ৩২

৭. পশু জবাই করার ইসলামীপদ্ধতি— দৃশ্যতঃ নির্দয়

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করে ? / ৩৮

৮. আমিষ খাদ্য মুসলমানদেরকে প্রচণ্ড উগ্র বানিয়ে ফেলে

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলমানদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে ? / ৪০

৯. মুসলমানরা কা'বার পূজা করে

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যেখানে আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে সেখানে তারা নিজেরাই কেন তাদের প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা / ৪১

১০. অমুসলিমদের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন ? / ৪৩

১১. শুকর মাংস নিষিদ্ধ

প্রশ্ন ঃ ইসলামে শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ? / ৪৫

১২. মদ্য পানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ঃ ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন ? / ৪৮

১৩. সাক্ষীদ্বয়ের সমতা

প্রশ্ন ঃ কেন দু'জনের সাক্ষী, যারা নারী— সমতূল্য মাত্র একজনের, যে পুরুষ ? / ৫২

১৪. উত্তরাধিকার

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারী সম্পদে একজন নারীর অংশ একজন পুরুষের অর্ধেক কেন ? / ৫৬

১৫. কুরআন কি আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ্‌র কথা ?

প্রশ্ন ঃ কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন আক্ষরিক অর্থেই কুরআন আল্লাহর কথা ? / ৬১

১৬. পরকাল— মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন ঃ কিভাবে প্রমাণ করবেন, পরকালের অস্তিত্ব অর্থাৎ 'মরনের পরে আবার একটি স্থায়ী জীবন আছে' ? / ৬১

১৭. মুসলমানরা এত ভাগে বিভক্ত কেন ? চিন্তধারার বিভিন্নতার কারণে কি ?

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা যেখানে এক এবং একই কুরআনের অনুসারী। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত বিভক্তি এবং চিন্তাধারার এত বিভিন্নতা কেন ? / ৬৮

১৮. সকল ধর্মই তো ভালো ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে কেন ?

প্রশ্ন ঃ সকল ধর্মই মূলত তার অনুসারীদেরকে ভালো ভালো কাজ করতে শিক্ষা দেয়। তা হলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে কেন ? যে কোনো একটি ধর্ম অনুসরণ করলে সমস্যা কোথায় ? / ৭২

১৯. ইসলাম ও আজকের মুসলমানদের মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যদি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হয় তাহলে অসংখ্য মুসলমান কেন এত অসৎ অবিশ্বস্ত এবং নিকৃষ্ট অপরাধ জগতের সাথে এমনভাবে জড়িত / ৭৭

২০. অমুসলিমদের কাফের বলা

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কেন অমুসলিমদের কাফের বলে গালি দেয় ? / ৮০

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের

জবাব

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ২০টি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের জবাব

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিয়ে
শুরু করছি তাঁরই নামে যিনি দয়াময় পরম দয়ালু

ভূমিকা

মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান একটি অর্পিত দায়িত্ব।

মুসলিম জাতির সচেতন অংশ খুব ভালো করেই জানেন যে, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা, যা গোটা মানব জাতির জন্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক এবং তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত মানুষ, অর্থাৎ 'মুসলিম'— তাদেরকে বাছাই করে নির্বাচন করা হয়েছে, মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের কাছে তাঁর বাণী যথাযথভাবে পৌঁছে দেবার দায়িত্বশীল করে।

কিন্তু হায়! অধিকাংশ মুসলিম তার সে দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যেখানে আমাদের নিজেদের স্বার্থে জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি হিসেবে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করাই ছিল একমাত্র কাজ। সেখানে আমাদের বাস্তবতা আজ এই যে, এতটুকু ইচ্ছাও কারো মধ্যে অনুভূত হয়না যে, যাদের কাছে এখন পর্যন্ত এ বাণী পৌঁছেনি তাদেরকে এই পরম সত্যের অংশীদার করে নেই।

আরবী শব্দ 'দা'ওয়াহ্‌র' অর্থ আহবান বা আমন্ত্রণ। ইসলামী পরিভাষায় এর তাৎপর্য— ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো। জ্যোতীর্ময় কুরাআন বলছে ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

.তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে প্রকাশ করেনা (এমন) 'উদ্ভাসিত সত্যকে', আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা তাদের কাছে দেয়া আছে ? এই যা কিছু তারা করছে এ ব্যাপারে আল্লাহ আদৌ উদাসীন নন। (২ ঃ ১৪০)

অত্যন্ত পরিচিত বিশটি সাধারণ প্রশ্ন

মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাবার প্রয়োজনে আলাপ আলোচনা ও মৃদু তর্কানুষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি হিসেবে অনুমোদিত। জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

আহবান করো (সবাইকে) তোমার প্রভূ-প্রতিপালকের পথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগ্মীতার সাথে এবং বির্তক করো তাদের সাথে এমনভাবে যা হৃদ্যতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। (১৬ ঃ ১২৫)

'একজন অমুসলিমের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো'— সাধারণত এটাই যথেষ্ট বলে প্রতিয়মান হয় যে, শুধু তার ইতিবাচক দিকগুলোকে সামনে তুলে ধরা। কেননা অধিকাংশ অমুসলিম যুক্তিসংগত ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত ইসলামের মহাসত্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারেনা শুধু এই কারণে যে, এমন কিছু নেতীবাচক প্রশ্ন তাদের মনের গভীরে গেঁথে আছে যা উত্তরহীন হয়েই থেকে যায়। ফলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি ইসলামের 'মানব প্রকৃতি' সম্মত ইতিবাচক বিষয়গুলোর দিকে প্রচণ্ড আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারলেও সেই উত্তরহীন প্রশ্নগুলো পেছনে টেনে ধরে রাখে।

বিতর্কে বসলে ইসলামের জীবনমুখী, মানবতাবাদী, ইতিবাচক প্রকৃতির প্রতি একমত বলে জানিয়ে দেবার সাথে সাথে সেই একই নিঃশ্বাসে বলে ফেলবে ঃ কিন্তু "তোমরা তো সেই মুসলমান যারা দুই-তিনটা বিয়ে করো"। "তোমরা তো সেই লোক যারা নারীকে অবরুদ্ধ করে পর্দার নামে ঘরে বন্দী করে রাখো" তোমরা হচ্ছ মৌলবাদী ইত্যাদি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অমুসলিম ভইদেরকে উদাত্তকণ্ঠে বলতে চাই (ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত সীমিত তা ভুল হোক বা শুদ্ধ, যেখান থেকেই তারা তা পেয়ে থাক) তাদের এই অনুভূতি ভুল বা ভ্রান্ত। আমি তাদেরকে উৎসাহিত করি খোলা মন নিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে। এবং আশ্বস্ত করি তাদেরকে যে, ইসলাম সম্পর্কে যে কোনো কটাক্ষ আমি খোলা মনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

দা'ওয়াহ্‌র ক্ষেত্রে বিগত কয়েকটি বছরে আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে আমার উপলব্ধি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণ একজন অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে

খুব বেশি হলে গোটা বিশেক প্রশ্ন করতে পারে। যখনই আপনি কোনো অমুসলিমকে প্রশ্ন করবেন, ইসলামের মধ্যে কি এমন ভুল আছে যা আপনি বোধ কারেণ ? উত্তরে সে গড়গড় করে পাঁচ ছয়টা প্রশ্ন করে ফেলবে। যেকোনো ভাবে এগুলো ঐ কুড়িটা প্রশ্নের মধ্যেই গিয়ে পড়বে।

যুক্তিসঙ্গত উত্তর অধিকাংশকে আশ্বস্ত করে

সাধারণভাবে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত কুড়িটি প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি সহকারে বিবেক সম্মতভাবে দেয়া যেতে পারে এবং অধিকাংশ অমুসলিম এই সঙ্গত উত্তরের মাধ্যমে আশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারেন। একজন মুসলমান যদি এই উত্তরগুলো মুখস্ত করেন অথবা অন্তত মনে রাখার চেষ্টা করেন— ইনশাআল্লাহ যে কোনো বিতর্কে তিনিই সফল হবেন। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে কোনো প্রতিপক্ষ সহসা মেনে না নিলেও অন্তত ইসলাম সম্পর্কে তার ভুল ধারণাসমূহ দূর করে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক উর্ধ্বমুখী চিন্তাধারাকে নিষ্ক্রীয় করে দেয়া যেতে পারে। অত্যন্ত ব্যতিক্রম কিছু অমুসলিম এসব প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন রাখতে পারে। যার জবাবে হয়তো আরো কিছু তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োজন পড়তে পারে।

প্রচার মাধ্যম যেসব ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে

অধিকাংশ অমুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয়েছে তার কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে ওদের ভুল ও মিথ্যা ইতিহাস এবং তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 'তথ্য-বোমা' বিস্ফোরণ। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম প্রধানত ক্ষমতার মদো-মত্ত পশ্চিমা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে। হোক তা আন্তর্জাতিক উপগ্রহ চ্যানেল, বেতার কেন্দ্র, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন অথবা বই-পুস্তক। সাম্প্রতিক কালে ইন্টারনেট অত্যন্ত শাক্তিশালী তথ্য-মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এ মাধ্যমটি যদিও বিশেষ কারো নিয়ন্ত্রনে নয়। কিন্তু তবু, যে কেউ এর মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারণার পর্বত সমান আয়োজন দেখতে পাবে।

নিঃসন্দেহে অনেক সচেতন মুসলমান এ হাতিয়ারটি ইসলামের আসল চেহারা তুলে ধরার নিরন্তর চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু বিরোধী প্রচারণার তুলনায় তা জোযন জোযন মাইল পেছনে পড়ে আছে। আমার বুক ভরা আশা যে, মুসলমানদের এই চেষ্টা দিন দিন আরো ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং তার ধারাবাহিকতা একদিন এমন অবস্থানে পৌঁছাবে যেখানে ওরা আজ অবস্থান করছে।

ভ্রান্ত ধারণাগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়

ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নগুলো বিভিন্ন সময় ও যুগের প্রেক্ষিতে ভিন্ন। আমাদের নির্ধারিত কুড়িটি প্রশ্ন বর্তমান যুগ ও প্রেক্ষিতের ওপর। এক দশক আগে এই প্রশ্নমালা ছিল এর রকম এবং একদশক পরেই এই প্রশ্ন-মালা হয়তো পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটা নির্ভর করে শুধুমাত্র প্রচার মাধ্যমের ওপর— কিভাবে সে তা প্রকাশ করছে।

ভুল ধারণাগুলো সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানুষের সাথে মতবিনিময় করে দেখেছি— ইসলাম সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কুড়িটি প্রশ্নই সব জায়গায় একই রকম। সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভেদে হয়ত দু'-একটি প্রশ্ন এর সাথে যুক্ত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকায় এর সাথে যুক্ত হবে 'সুদের লেন-দেনকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে কেন' ?

এভাবে ভারতীয় সামাজিকতার প্রেক্ষিতে আমি এই কুড়িটির সাথে আরো একটি যোগ করেছি। যেমন ভারতীয় অমুসলিমদের প্রশ্ন— মুসলমানরা কেন এত আমিষ খাদ্য খায় বা তারা নিরামিষভোজী নয় কেন ? এ প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্তির বিশেষ কারণ হলো, বিশ্ব জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়। অন্যকথায় পৃথিবীর শতকরা ২০% ভাগ মানুষ ভারতীয় বংশদ্ভুত এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তারা বসবাস করছে। তাই তাদের প্রশ্নগুলো বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের প্রশ্নগুলোর মতোই সাধারণ পর্যায়ে উঠে এসেছে।

অসংখ্য অমুসলিম রয়েছে যারা ইসলামকে জানার জন্য অধ্যয়ন করছে

অসংখ্য অমুসলিম রয়েছে যারা ইসলামকে জানার জন্য অধ্যয়ন করে— এবং যারা করছে তাদের অধিকাংশই যেসব বই-পুস্তক পড়ছে তার লেখক পক্ষপাতদুষ্ট— ইসলামের সমালোচক। এদের বাড়তি সংজোযন হলো কুরআনে তারা পরস্পর বিরোধী কথা-বার্তা দেখতে পেয়েছে এবং কুরআন অবৈজ্ঞানিক ইত্যাদি।

ইসলাম সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখেন এমন অমুসলিমদের সাধারণ কিছু প্রশ্নের জবাব এই শিরোনামে আমার ভাষণ, বই, ক্যাসেট ও সিডি আকারে সুরক্ষিত আছে। আগ্রহী ব্যক্তি তার যেকোন একটি সংগ্রহ করে, পড়ে বা শুনে নিতে পারেন।

১. বহু-বিবাহ

প্রশ্ন ঃ ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় কেন ? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন ?

জবাব

ক. বহু বিবাহের সংজ্ঞা

'বহু-বিবাহ' মানে এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের— একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে। আর একটি বহু স্বামী বরণ। অর্থাৎ একজন স্ত্রীলোক একাধিক পুরুষ বিবাহ করে। ইসলামে পরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক 'বহু-বিবাহ' অনুমোদিত। অপর দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 'হারাম'।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। কেন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায় ?

খ. পৃথিবীতে কুরআ'নই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ, যে বলে "বিবাহ করো মাত্র একজনকে"

ভূ-পৃষ্টের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই বাক্যাংশ ধারণ করে আছে— "বিবাহ করো মাত্র একজনকে' আর কোনো ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ করে একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে। অন্য কোনো ধর্ম-গ্রন্থ— হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, অন্যদিকে তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবের মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের করতে পারবে কি কেউ ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে— যতজন তার ইচ্ছা। এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীস্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এ নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে।

অসংখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী রেখেছে। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল!

বাইবেলে যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু আগের কালের খ্রীস্টান পুরুষরা যে-ক'জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাদের চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।

ইহুদীবাদে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদিয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের [সুলাইমান (আ)]-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী। বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের "রাব্বাঈ" জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ সি.ই থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি অনুশাসন জারি করেন। ইহুদীদের 'সেফারডিক' সমাজ যারা প্রধানত মুসলমানদের দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ধরে রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ জারি করে দেয়।

একটি লক্ষণীয় বিষয় ঃ ১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাইতে অগ্রগামী। কমিটি অফ দি স্টাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) নামে এ বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে। বইয়ের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ-সংক্রান্ত বিবাহ, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলমানদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪. ৩১%)। ভারতীয় আইন অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত। ভারতে যেকোনো অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে। এর আগে তো কোনো বিধিনিষেধই ছিলনা। এমনকি হিন্দু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হলো এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। বর্তমানে এটা একটা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা নিয়ন্ত্রীত করেছে একজন হিন্দু পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখতে — "হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ" নয়।

আসুন এবার দেখা যাক ইসলাম কেন একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়।

গ. কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয়

আমি আগে যেমন বলে এসেছি ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা বলে 'বিবাহ করো মাত্র একজনকে'। কথাটি জ্যোতীর্ময় কুরআনের সূরা নিসার নিম্নদ্ধৃত আয়াতের অংশ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۞

বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী— দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা (তাদের সাথে) ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো— তাহলে মাত্র একজন। (৪ ঃ ৩)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বহু-বিবাহের কোনো মাত্রা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান প্রায় প্রতিটি মানুষ এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ' এর মাত্রা না ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না। কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দিল। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা এই কঠিন শর্তের মধ্যে আবদ্ধ যে, কেবলমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

একই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ ۞

তুমি কস্মিনকালেও পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে ভাসাম্যপূর্ণ সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে। (৪ঃ১২৯)

কাজেই ইসলামে বহু-বিবাহ কোনো বিধান নয় বরং ব্যতিক্রম। বহু মানুষ এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা বাধ্যতামূলক।

করা এবং না করার ক্ষেত্রে ইসলামের পাঁচটি শ্রেণী-বিন্যাস করা আছে।

১. ফরজ— অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব— অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত।

৩. মুবাহ— অনুমোদন যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য।

৪. মাকরূহ— অনুমোদিত নয় বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম— বে-আইনী বা নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে বহু-বিবাহ মধ্যম শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য এবং কোনো ভাবে এমন কথা বলা যাবে না যে, একজন মুসলিম, যার দুজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী আছে, সে তার তুলনায় ভালো মুসলিম যার স্ত্রী মাত্র একজন।

ঘ. গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি

প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রায় সমান। একটি নারী শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষ শিশুর চাইতে বেশি। একটি নারী শিশু রোগ-জীবানু ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে পুরুষ শিশুর চাইতে বেশি লড়াই করতে পারে। এ কারণে শিশুকালে নারীর তুলনায় পুরুষের মৃত্যু হার বেশি।

যে কোনো যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের চাইতে নারীর বেশি। মহাকালের যে কোনো যুগে খুঁজে দেখলে দেখা যাবে— বিপত্নীকের চাইবে বিধবার পরিমাণ অনেক বেশি।

ঙ. ভারতে পুরুষের জন্ম-সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশি। এর কারণ নারী শিশুর ভ্রূণ-হত্যা ও নারী শিশু হত্যা।

প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে তুলনামুলক ভাবে ভারতীয় পুরুষ-জনসংখ্যা নারী-জন সংখ্যার চাইতে বেশি। এর নেপথ্য কারণ, নারী শিশু হত্যার উচ্চ হার। প্রতি বছর ন্যুনতম দশলাখ 'নারী-ভ্রূণের' গর্ভপাত ঘটানো হয় এই দেশে যখনই মায়ের গর্ভে তাকে নারী হিসাবে সনাক্ত করা যায়। যদি এই অভিষণ্ড চর্চ্চা বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতেও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

চ. বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে অধিক

আমেরিকায় পুরুষের চাইতে সত্তুর লক্ষ আশি হাজার নারী বেশি। শুধু নিউইয়র্কে পুরুষের চেয়ে দশলাখ নারী বেশি। উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ এই লোকেরা কোনো নারী-সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়। ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যার সমসংখ্যক নারী বাদ দিলে চল্লিশ লক্ষ অতিরিক্ত নারী। একই ভাবে জার্মানীতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী। রাশিয়ায় নব্বুই লাখ। এরপর শুধু আল্লাহই বলতে পারেন গোটা পৃথিবীতে একজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী ধরে নিলে তারপর কত নারী অতিরিক্ত থেকে যাবে।

ছ. প্রতিটি পুরুষের জন্য মাত্র একজন স্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বাস্তবতা বিবর্জিত

আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে নারীকে বিবাহ করে তারপরেও তিন কোটির বেশি নারী থেকে যাবে এমন, যারা তার জন্য কোনো স্বামী পাবে না। উপরন্তু মনে রাখতে হবে, সারা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশি। এভাবে চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের বেশি জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়ায় — যারা কোনো স্বামী পাবে না।

ধরাযাক, আমার বোন আমেরিকা নিবাসী একজন অবিবাহিতা মহিলা অথবা আপনার বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা নারী। সেখানে তার জন্য দুটি বিকল্প পথ খোলা আছে— হয় সে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী আছে অথবা তাকে হতে হবে "জনগণের সম্পত্তি"— অন্য কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে যারা রুচিশীলা তারা প্রথমটাই বেছে নেবে।

অধিকাংশ নারী অন্য নারীর সাথে তার স্বামীকে ভাগাভাগি করতে রাজি হবে না। কিন্তু ইসলামে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা-ই অপরিহার্য হয়ে ওঠে— "মুসলিম নারী তার যথার্থ ঈমানের কারণে এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় ক্ষতি ঠেকাতে তার আর এক মুসলিম বোনকে জনগণের সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন"।

জ. জনগণের সম্পত্তি হওয়ার চাইতে এজন বিবাহিত পুরুষ বিয়ে করা শ্রেয়

পশ্চিমা সমাজের একজন পুরুষের 'মেয়ে-বন্ধু' খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক। এক্ষেত্রে নারীরা যাপন করে মর্যাদাহীন এক অনিশ্চিত-অরক্ষিত জীবন। অথচ সেই একই সমাজ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে রাজি নয়। যেখানে নারী হতে পারতো একজন সম্মানিতা, মর্যাদাময় অবস্থানের অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপত্তাপূর্ণ নিরাপদ জীবন।

যেখানে নারীর সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা। যে স্বাভাবিকভাবে কোনো স্বামী পাবেনা তাকে হয় একজন বিবাহিত পুরুষকেই বিয়ে করতে হবে নতুবা হতে

হবে জনগণের সম্পত্তি। ইসলাম পছন্দ করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে, প্রথম পথের অনুমোদন দিয়ে এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টিকে।

আরো কিছু কারণ রয়েছে যে সবের জন্য ইসলাম নিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ অনুমোদন করে। কিন্তু প্রধানত নারীর সম্মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম সুরক্ষাই লক্ষ্য।

২. একাধিক স্বামী

প্রশ্ন ঃ একজন পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়, তাহলে ইসলাম একজন নারীকে কেন একাধিক স্বামী রাখতে নিষেধ করে?

জবাব

অসংখ্য মানুষ যার মধ্যে অনেক মুসলমানও রয়েছে, প্রশ্ন করেন— মুসলিম পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পাচ্ছে অথচ নারীর ক্ষেত্রে সে অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, এর যৌক্তিকতা কি? অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে যে কথাটি প্রথমেই আমাকে বলে নিতে হবে, তা হলো ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তির ওপরেই একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষকে সমান মান দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে সামর্থ ও যোগ্যতার ভিন্নতা এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব কর্তব্যের বিভিন্নতা দিয়ে। শারিরীক ও মানসিক ভাবে নারী ও পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব-কর্তব্যও বিভিন্ন। ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু একই রকম নয়।

সূরায়ে নিসার ২২ থেকে ২৪ আয়াতে একটি তালিকা দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষ কোন কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবে না। এর পরে ২৪ আয়াতে আলাদা করে বলা হয়েছে সেই সব নারীও (নিষিদ্ধ) যারা অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আছে— অর্থাৎ অন্যের বউ।

ইসলামে নারীর জন্য বহু-স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ কেন, নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো তা পরিষ্কার করে দেবে।

ক. একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। শিশুর পিতা কে আর মাতা কে। অপরদিকে একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ

পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুর শুধু মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে— বাবার নয়। পিতা ও মাতার সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোষহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিরা বলেন, যে শিশু তার মাতা-পিতার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে পিতার— সে শিশু তীব্র মানসিক জটিলতা ও হীনমন্যতায় ভোগে। এ শিশুদের শৈশব নিকৃষ্টতর এবং আনন্দহীন। দেহপসারিণী বা বেশ্যাদের সন্তানরা এর জলন্ত প্রমাণ। এদের শিশুকাল ও কৈশোর মর্মান্তিক। বহু স্বামী গ্রহণকারী পরিবারে জন্ম পাওয়া শিশুকে নিয়ে কোনো স্কুলে ভর্তী করতে গেলে যদি মাকে প্রশ্ন করা হয় শিশুর পিতার নাম ? তা হলে সে মাকে দু'জন অথবা তার বেশি পুরুষের নাম বলতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখন জেনেটিক পরিক্ষার মাধ্যমে মাতা ও পিতা উভয়কে সনাক্ত করার কৌশল আবিষ্কার করেছে। কাজেই যে বিষয়টা অতীতে অসম্ভব ছিল বতর্মানে তা খুব সহজেই হতে পারে।

খ. প্রকৃতি প্রদত্ত্ব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট, বহুগামীতায় নারীর চাইতে পুরুষের বেশি।

গ. শারীরিক যোগ্যতায় একজন পুরুষের পক্ষে কয়েকজন স্ত্রীর স্বামীর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন সহজ। একজন নারী সেই একই অবস্থানে, অর্থাৎ যার কয়েকজন স্বামী আছে, তাদের স্ত্রী হিসেবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপর বর্তায় তা পালন করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেননা মাসিক ঋতুচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিক ও আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে তাকে পড়তে হয়।

ঘ. একজন নারী যার একাধিক স্বামী থাকবে— তাকে তো একই সাথে কয়েকজনের যৌন-সঙ্গী হতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সমূহ সম্ভাবনা থাকবে যৌন রোগের এবং যৌনতার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার। উপরন্তু তার মাধ্যমেই সে সব রোগে তার স্বামীরা আক্রান্ত হবে। এমনকি যদি তার স্বামীদের কারো অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক নাও থেকে থাকে। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ— যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে, স্ত্রীদের কারো যদি বিবাহ বহির্ভূত অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক না থাকে তাহলে যৌনতা সংক্রান্ত কোনো রোগে আক্রান্ত হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।

উপরোল্লেখিত কারণগুলো এমন যা যে কারো পক্ষে চেনা এবং বুঝে নেয়া সম্ভব। এছাড়া হয়তো আরো অসংখ্য কারণ থাকতে পারে যে কারণে অন্তহীন

জ্ঞানের আধার সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য বহু স্বামী বরণ নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. 'হিজাব' বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন ঃ ইসলাম পর্দার আড়ালে রেখে নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে ?

জবাব

ইসলামে নারীর মর্যাদা'— ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর একটা উপুর্যপরি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল— 'হিজাব' বা ইসলামী পোশাক। ইসলামী বিধি বিধানে নারী নিগ্রহের সবচাইতে বড় প্রমাণ হিসেবে যা কথায় কথায় দেখানো হয়। ধর্মীয়ভাবে নারীর জন্য রক্ষণশীল পোশাক বা পর্দা ফরয করার নেপথ্য কারণগুলো আলোচনার পূর্বে ইসলাম আগমনের পূর্বে বিশ্বসমাজে সামগ্রীকভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কি ছিল তা নিয়ে কিঞ্চিৎ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ক. ইসলাম-পূর্ব কালে নারীর-মর্যাদা বলতে কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিলনা। তারা ব্যবহৃত হতো ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো সর্বজনমান্য বিশ্ব-ইতিহাস থেকে তুলে আনা হয়েছে। সমুদয় মিলে যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসবে তাতে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাবো ইসলাম-পূর্ব সভ্যতাগুলোতে নারীর 'মর্যাদা' বলতে কিছুই ছিলনা। হীন নীচ এমনকি ন্যুনতম 'মানুষ' হিসেবেও তারা গণ্য ছিল না।

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ঃ ব্যাবিলনীয় আইনে নারীর কোনো ধরনের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। মূল্য-মর্যাদা কি ছিল একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট করে দেবে। কোনো পুরুষ যদি ঘটনাক্রমে কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যদণ্ড দেয়া হতো।

২. গ্রীক সভ্যতা ঃ গ্রীক সভ্যতাকে পূর্বকালের সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ও উজ্জ্বলতম গণ্য করা হয়। তথাকথিত এই উজ্জ্বলতম সভ্যতায় নারী ছিল সব রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু অস্তিত্বগত ভাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। একারণে তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। গ্রীক পৌরাণিক শাস্ত্রের এক কাল্পনীক নারী যার নাম "প্যানডোরা"। বিশ্ব মানবতার সকল দুর্ভাগ্যের মূল কারণ সেই নারী।

তাই গ্রীকরা নারীকে 'প্রায় মানুষ' অর্থাৎ মানুষের মতো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ নয় বলে মনে করত। পুরুষের সাথে তার কোনো তুলনাই হয়না এমন। অপরদিকে নারীর সতীত্ব ছিল মহামূল্যবান কিছু এবং দেবীর মতো সম্মানও করা হতো। কিছুকাল পরেই এই গ্রীকরা আত্মঅহংকারের উত্তুঙ্গে উঠে ধরাপড়ে বিকৃত যৌনাচারের হাতে, বেশ্যালয়ে গমনাগমন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

৩. **রোমান সভ্যতা ঃ** রোমান সভ্যতা যখন তার বিকাশের শিখর চূড়ায় তখন একজন পুরুষ যে-কোনো সময় তার স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকার রাখতো। নগ্ন নারী যে-কোনো আসরের সৌন্দর্য এবং বেশ্যালয় যাতায়াত পুরুষের সংস্কৃতি।

মিসরীয় সভ্যতা ঃ মিসরীয় সভ্যতায় নারী 'ডাইনী' এবং শয়তানের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতো।

ইসলাম-পূর্ব আরব ঃ ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীর অবস্থান ছিল ঘরের অন্যান্য ব্যাবহারীক আসবাবপত্রের মতো। অনেক পিতা অসম্মানের হেতু হিসেবে তার শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দিত।

খ. ইসলাম নারীকে ওপরে উঠিয়েছে। দিয়েছে তাদেরকে সমতা এবং প্রত্যাশা করে— তারা তাদের মর্যাদা রক্ষা করবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে ওপরে উঠিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে সংরক্ষণ করতে চায়।

পুরুষের পর্দা ঃ মানুষ সাধারণত পর্দা নিয়ে আলোচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে। অথচ জ্যোতীর্ময় কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন। সূরা নূরে বলা হয়েছে।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

বলো! বিশ্বাসী পুরুষদেরকে— তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে। এটা তাদেরকে আরো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন (মানসিকতার) করে তুলবে, আর আল্লাহ কিন্তু সেই সব কিছুই জানেন যা তোমরা করো। (২৪ ঃ ৩০)

যে মুহূর্তে কোনো পুরুষ একজন নারীর দিকে তাকাবে— লজ্জাকর অশ্লীল চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। কাজেই তার দৃষ্টি অবনত রাখাই তার জন্য কল্যাণকর।

নারীর জন্য পর্দা ঃ সূরা নূরের পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ ۞

এবং বলো, বিশ্বাসী নারীদেরকে— তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের সযত্ন সংরক্ষণ করে এবং তাদের দৈহীক সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে অনিবার্য্য ভাবে যা উন্মুক্ত থাকে। তারা যেন তাদের বক্ষের ওপরে চাদর ঝুলিয়ে দেয় এবং প্রদর্শন না করে তাদের সৌন্দর্য, তাদের স্বামী তাদের পিতা তাদের স্বামীর পিতা (শশুর) এবং সন্তানদের ছাড়া। (২৪ ঃ ৩১)

গ. হিজাবের ছয়টি শর্ত

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হিজাব পালনের ছয়টি শর্ত।

১. মাত্রা বা পরিমাণঃ প্রথম শর্ত হলো দেহের সীমানা যা যতটুকু— অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। নারী ও পুরুষের জন্য এটা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের জন্য ঢেকে রাখার বাধ্যতামূলক পরিসীমা তার দেহের ন্যুনতম নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য এই পরিসীমা আরো বিস্তৃত— কব্জী পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া বাদবাকি শরীরের সকল অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তারা যদি চায় তাহলে তা-ও আবৃত করে নিতে পারে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অনেকেই হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার অংশ মনে করেন। বাদবাকি পাঁচটি শর্ত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই রকম প্রযোজ্য।

২. পরিধেয় পোষাক ঢিলেঢালা হতে হবে। যেন দেহের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়।

৩. পরিধেয় কাপড় এতটা পাতলা ও স্বচ্ছ হতে পারবেনা যাতে ভেতরটা দেখা যায়।

৪. পোশাক এতটা আকর্শণীয় ও জাকজমকপূর্ণ হতে পারবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়।

৫. পোশাক এমন হতে পারবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো বা সমরূপ।

৬. পোশাক এমন হতে পারবে না যা দেখতে অবিশ্বাসীদের মতো। তাদের এমন কোনো পোষাক পরা উচিৎ নয় যা বিশেষভাবে পরিচিত এবং চিহ্নিত অন্য ধর্মাবলম্বীদের (যারা মূলত অবিশ্বাসী)।

ঘ. অন্যান্য জিনিসের মধ্যে আচার-আচরণও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত

ছয় ধরনের পরিচ্ছদের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, অভিব্যক্তি এবং লক্ষ উদ্দেশ্যকেও একিভূত করে। একজন ব্যক্তি সে যদি শুধু কাপড়-চোপড়ে হিজাব পালন করে তাহলে সে 'হিজাব' পালন করল ন্যূনতম পর্যায়ের। পোশাকের পর্দা পালনের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা চিন্তা-ভাবনার পর্দা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। পর্দার সীমার মধ্যে আরো যা পড়ে, তা হলো— ব্যক্তির চলা, কথা বলা এবং তার সার্বিক আচরণ ইত্যাদি।

ঙ. হিজাব বা পর্দা অহেতুক উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে

নারীকে কেন পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। সূরা অহ্যাবে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

হে নবী! বলুন আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং বিশ্বাসী নারীদেরকে যে, তারা যেন তাদের বহিরাবরণ পরে থাকে (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাদের পরিচিতির অত্যন্ত উপযোগী। (তারা যেন পরিচিত হয় বিশ্বাসী-নারী হিসাবে) তাহলে আর অহেতুক উৎপিড়ীত হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান। (৩৩ ঃ ৫৯)

জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ নারীকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, তারা যেন রুচিশীলা পরিচ্ছন্ন নারী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এবং এটা তাদেরকে লজ্জাকর উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে।

চ. দু'টি জমজ বোনের উদাহরণ

ধরা যাক জমজ দু'টি বোন। উভয়ই অপূর্ব সুন্দরী। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন পরেছে ইসলামী হিজাব। অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহ আবৃত। শুধু কব্জী পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল খোলা। অন্যজন পরেছে পশ্চিমা পোশাক। শরীরের অধিকাংশ খোলা এবং প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। সামনেই এক মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে এক দঙ্গল যুবক। মেয়েদেরকে দেখে হৈ- হল্লা করা, শীশ দেয়া আর বাগে পেলে উত্ত্যক্ত করাই তাদের কাজ। এখন এই দুই বোনকে যেতে দেখে তারা কাকে উদ্দেশ্য করে হল্লা করবে ? শীশ দেবে ? যে মেয়টি নিজেকে ঢেকে রেখেছে তাকে দেখে, না যে মেয়েটি প্রায় উদোম হয়ে আছে তাকে দেখে ? খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চোখ যাবে যে নিজকে দেখাতে চায় তার দিকে। কার্যত এ ধরনের পোশাক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি 'ভাষাহীন নিরব আমন্ত্রণ'। যে কারণে বিপরীত লিঙ্গ উত্তেজিত হতে বাধ্য হয়। জ্যোর্তীময় কুরআন যথার্থই বলেছে— 'হিজাব নারীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে'।

ছ. ধর্ষকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন পুরুষ যদি কোনো নারী ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন এই কঠিন বাক্য শুনে। কেউ কেউ তো বলেই বসেন, ইসলাম অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বর্বরদের ধর্ম। শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি— ধরুন, আল্লাহ না করুন কেউ একজন আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে অথবা আপনার বোন বা কন্যা। আপনাকে বিচারকের আসনে বসানো হয়েছে এবং ধর্ষণকারীকে আপনার সামনে হাজির করা হয়েছে। কি শাস্তি দেবেন তাকে? প্রত্যেকের উত্তর একটিই— "মৃত্যুদণ্ড'। কেউ বলেছেন, ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে আমার চোখের সামনে ব্রাস ফায়ার করে ঝাঝরা করে দিতে বলব। কেউ বলেছেন ওকে তিল তিল করে মৃত্যুর স্বাদ দিয়ে দিয়ে মারতে বলব। এই উত্তর দাতাদের কাছেই আমার প্রশ্ন, আপনার মা-বোন স্ত্রী কন্যাকে কেউ ধর্ষণ করলে তাকে ওভাবে মেরে ফেলতে চান। কিন্তু এই একই অপরাধ যদি অন্য কারো

স্ত্রী-কন্যার ওপর ঘটে তখন এই আপনিই বলেন মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যায়। কেন ভাই, একই অপরাধের জন্য ক্ষেত্রভেদে দুই রকম দন্ড ?

জ. নারীকে মর্যাদা দেবার পশ্চিমা সমাজের দাবি সর্বৈভ মিথ্যাচার

নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা শ্লোগান একটি প্রকাশ্য প্রতারণা। তার দেহের সৌন্দর্যকে খুলে খুলে ব্যবসা করার একটি লোভনীয় ফাঁদ। তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করে দেবার শয়তানী ষড়যন্ত্র। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, নারীকে তারা যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। আর প্রকাশ্য বাস্তবতা হলো তাদেরকে তাদের সম্মানিত অবস্থান থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা এবং সৌখীন সমাজের লালসা পূরনের জন্য উড়ন্ত প্রজাপতি বানিয়ে ছেড়েছে। ফলে তারা এখন বিলাসী পুরুষের নাগালের মধ্যে থাকা ভোগের পুতুল আর যৌন কারবারীদের ব্যবসায়ের সস্তা পণ্য। যা আড়াল করা হয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতির মনোলোভা রঙিন পর্দা দিয়ে।

ঝ. নারী ধর্ষণের হার আমেরিকায় সর্বোচ্চ

উন্নত বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নৈমিত্যিক সংঘটিত নারী ধর্ষণের হার সারা বিশ্বে তার রেকর্ড কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। ১৯৯০ সালের এফবিআই–এর দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১৭৫৬ টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যাতে প্রতিদিন সংঘটিত ধর্ষণ অপরাধের সংখ্যা ১৯০০ উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে সন উল্লেখ করা নেই তবে অনুমান করা হয় তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সালের কথা। হয়তো আমেরিকানরা পরবর্তী দু'তিন বছরে আরো 'সাহসী' হয়ে উঠেছে।

এবার একটা কাল্পনীক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করা যাক— আমেরিকান নারী সমাজ ইসলামী হিজাব পালন করছে। যখনি কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে, কোনো অশ্লীল চিন্তা মনে এসে যেতে পারে ভাবার সাথে সাথে সে তার দৃষ্টিকে নীচে নামিয়ে নিচ্ছে। পথে ঘাটে যেখানেই কোনো নারী দৃশ্য হচ্ছে, কব্জী পর্যন্ত তার দুটি হাত আর নেহায়েত সাদামাটা সাজগোজহীন মুখমন্ডলের কিয়দাংশ ব্যাস, বাদবাকি সব ঢিলাঢালা হিজাবে ঢাকা। তদুপরি রাষ্ট্রীয় বিধান এমন যে, যদি কোনো পুরুষ ধর্ষণের অপরাধ করে তার জন্য নির্দিষ্ট— জনসমক্ষে প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড।

এবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, গোটা পরিবেশটা যদি সত্যি সত্যিই এমন হয় তাহলে আমেরিকার এই নারী ধর্ষণের ভয়ঙ্কর হার আরো বাড়তে থাকবে না একই অবস্থানে থাকবে ? নাকি কমে যাবে এবং কমতে কমতে একদিন এই জঘন্য অপরাধ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ঞ. ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বিধান কর্যকর হলে ধর্ষণের হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। কেননা শরীয়তের বিধান, মানুষেরই জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা বিধাতার নির্বাচিত বিধিবিধান— যদি কার্যকর হয় তাহলে তার ফলাফল কল্যাণী অমিয় ধারা হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। ইসলামী শরীয়ত যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডে— তা আমেরিকাই হোক অথবা ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো দেশে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, সে দেশের গোটা সমাজ একসাথে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে।

কাজেই 'হিজাব' নারীকে অপদস্ত করেনি বরং উপরে তুলে সম্মানের আসন দিয়েছে। আর সংরক্ষণ করেছে তার শালীনতা ও পবিত্রতা।

৪. ইসলাম কি তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে ?

প্রশ্ন ঃ ইসলামকে কিভাবে শান্তির ধর্ম বলা যাবে যেখানে তা প্রচার ও প্রসার হয়েছে তলোয়ারের মাধ্যমে ?

জবাব

কিছু অমুসলিমের এটা একটা সাধারণ অভিযোগ যে, সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলাম এত কোটি কোটি অনুগামী পেতে পারতো না, যদি না তা— শক্তি প্রয়োগে প্রসারিত হতো। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দেবে, যা তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারের অভিযোগ থেকে অনেক দূরে। এটা ছিল সত্যের সহজাত শক্তি, সঙ্গত কারণ ও মানব প্রকৃতি সম্মত যৌক্তিকতা যা এত দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বাহন হয়েছে।

ক. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম এসেছে মূল শব্দ 'সালাম' থেকে। যার অর্থ শান্তি। এর আরো একটি অর্থ হলো নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা-শক্তিকে আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত করা। এভাবে

ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, যা অর্জন করা যায় সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে সমর্পিত করে দিলে।

খ. শান্তি বজায় রাখতে কখনো কখনো শক্তি ব্যাবহার করতে হয়

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুকুলে নয়। এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যারা তাদের নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এর বিঘ্ন ঘটায়। এসব ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শক্তি ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধী ও সমাজ বিরোধীদের দমন করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সুসজ্জিত বাহিনী আছে। যাদের আমরা 'পুলিশ' বলি। ইসলাম শান্তির প্রবর্তক। একই সাথে তার অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করে জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কোনো কোনো সময় শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ইসলাম কেবল মাত্র মানুষের সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়।

গ. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসী ওলেরীর মন্তব্য

বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক ডি ল্যাসী ওলেরী' লিখিত "ইসলাম অ্যাট দা ক্রস রোড" গ্রন্থের অষ্টম পৃষ্ঠায় যে মন্তব্য তিনি করেছেন তাতে "তরবারীর সাহায্যে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে" এই ভ্রান্ত ধারণায় যারা নিমজ্জিত— তাদের জন্য দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

"অবশেষে ইতিহাসই একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করল যে, 'ধর্মান্ধ মুসলমানদের কাহিনী হলো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তারা ঝেঁটিয়ে বেরিয়েছে আর বিজিত জাতিগুলোকে তরবারীর অগ্রভাগে রেখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে'। এটা অনেক গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কল্পনা প্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী— যা ঐতিহাসিকরা খুব বেশি পুনরাবৃত্তি করেছে"।

ঘ. মুসলমানরা আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে

প্রায় আট'শ বছর স্পেন শাসন করেছে মুসলমানরা। সেখানে মানুষকে 'তরবারীর শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করেছে' —এমন কথা চরম শত্রুও বলতে লজ্জা পাবে। আর খ্রীস্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে এসে সেই

মুসলমানদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অবশেষে এমন একজন মুসলমান স্পেনে ছিল না যে তার নামাযের জন্য প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত।

ঙ. ১৪ মিলিয়ন আরব মিশরীয় খ্রীস্টান

সমগ্র আরব ভুখণ্ডে এক হাজার চারশ বছর মুসলমানরাই ছিল মালিক, মনিব, শাসক। এর মধ্যে সামান্য কিছু বছর ব্রিটিশ এবং আর কিছু বছর ফরাসীরা দখলদারিত্ব করেছিল। সর্বোপরি মুসলমানরাই ১৪০০ বছর আরব শাসন করে আসছে। তারপর আজও সেখানে ১৪ মিলিয়ন খ্রীস্টান কিভাবে থাকলো ? যারা বংশ পরম্পরায় আরবেই আছে। মুসলমানরা যদি তরবারী ব্যবহার করত তাহলে একজন খ্রীস্টানও কি সেখানে এখন খুঁজে পাওয়ার কথা ?

চ. ভারতে ৮০% এর বেশি অমুসলিম

মুসলমানরা ভারত শাসন করেছে প্রায় আটশ বছর। যদি তারা চাইতো তাহলে তাদের সেই রাজ-শক্তি ও ক্ষমতার বল প্রয়োগ করে ভারতের প্রতিটি অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করে নিতে পারত। অথচ শতকরা আশি ভাগেরও বেশি অমুসলিম আজো ভারতেই আছে। এদের প্রতিটি অমুসলিম আজ সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, "ইসলাম তরবারীর সাহায্যে প্রসারিত হয়নি।"

ছ. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া একটি দেশ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ-সংখ্যক মুসলমান সেখানে বাস করে। মালয়েশিয়ায় জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান। কেউ একজন প্রশ্ন করতে পারে, কোন মুসলিম সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল ?

জ. আফ্রিকার পূর্বপ্রান্ত

একই ভাবে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আফ্রিকার পূর্বতীরে বিকাশ লাভ করে। কেউ একজন আবারো প্রশ্ন করতে পারে, ইসলাম যদি তরবারীর অগ্রভাগ দিয়েই প্রসারিত হয়ে থাকে তাহলে আফ্রিকার পূর্বতীরে কোন মুসলিম বাহিনী তরবারী নিয়ে গিয়েছিল ?

ঝ. থমাছ কারলাইল

বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক থমাস কারলাইল তার রচনা 'হিরোয এণ্ড হিরো ওরশিপ' গ্রন্থে ইসলামের বিকশিত হওয়া নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা সেই প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে— "তরবারী, কিন্তু কোথায় পাবে তুমি তোমার তরবারী ? প্রত্যকটি নতুন 'মত' তার শুরুতে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়— এক জনের সংখ্যালঘুত্বে। মাত্র একজন মানুষের মাথায়। সেখানেই তা থাকে। সারা পৃথিবীর একজন মাত্র মানুষ তা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ সকল মানুষের বিপক্ষে মাত্র একজন মানুষ। একখানা তরবারী সে নিল এবং তা দিয়ে তা (তার চিন্তা) প্রচার করতে চেষ্টা করল। তাতে তার কোনো কাজ হবে কি ? তোমার তরবারী তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে! মোট কথা একটি জিনিস নিজে নিজেই প্রচারিত হবে যেমনটা তার ক্ষমতা আছে।"

ঙ. দ্বীন নিয়ে কোনো জবরদস্তি নেই

কোন তরবারী দিয়ে ইসলাম বিকশিত হয়েছে ? এমনকি সে তরবারী যদি মুসলমানদের হাতেও থাকতো তাহলেও তারা তা ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারত না, কারণ তাদের হৃদয় স্পন্দন আল কুরআন বলছে ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۞

দ্বীন নিয়ে কোনো জবরদস্তি নেই। সকল ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে সরল-শুদ্ধ সত্য-পথ স্পষ্ট করে দেয়া আছে। (২ ঃ ২৫৬)

চ. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তরবারী

তা ছিল চেতনা ও জ্ঞানের তরবারী, যে তরবারী মানুষের হৃদয় ও মন অন্তরকে জয় করেছে। জ্যোতীর্ময় কুরআনের সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۞

আহবান করো সকলকে তোমার বিধাতা প্রতিপালকের পথে— পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুন্দরতম বাগ্মীতার সাথে। আর যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করো তাদের সাথে এমনভাবে, যা সর্বোত্তম (এবং সে আহবান হতে হবে এমন হৃদ্যতাপূর্ণ যেন কোন পাষাণ হৃদয়ের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হয়)। (১৬ ঃ ১২৫)

ছ. ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধর্ম সমূহের বর্ধিষ্ণুতা

১৯৮৬ সালের রীডার্স ডাইজেস্টের 'এ্যালমানাক' সংখ্যার একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধে— পূর্বের অর্ধ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমূহের বর্ধিষ্ণুতার হার

সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি "প্লেইন ট্রুথ" মাগ্যাজিনেও প্রকাশিত হয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ইসলাম— যা বেড়েছে ২৩৫% হারে। আর খ্রীস্টবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪৭% হারে। এখানে একজন প্রশ্ন করতে পারে, কোন যুদ্ধ অবস্থান নিয়েছিল এই শতাব্দীতে যা কোটি কোটি মানুষকে ধর্মান্তরীত করে মুসলমান বানিয়েছিল ?

চ. আমেরিকা ও ইউরোপে 'ইসলাম' দ্রুততম বর্ধিষ্ণু ধর্ম

আজকের দিনে আমেরিকায় দ্রুততম বর্ধিষ্ণু ধর্ম 'ইসলাম'। মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে ইউরোপেও। শক্তি ও বিকশিত সভ্যতার অহংকারে চীৎ হয়ে থাকা পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সব সু-সভ্য মানুষকে এত বিরাট সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে কোন তরবারী বাধ্য করছে ?

ড. ডক্টর জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসন

ডক্টর জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন, যারা আশঙ্কা করছে আনবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যেই ফেলে দেয়া হয়েছে। এটা পড়েছে সেদিন— যেদিন 'মুহাম্মাদ (স) জন্ম নিয়েছিলেন।

৫. মুসলমানরা মৌলবাদি এবং সন্ত্রাসী

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের অনেকেই মৌলবাদি ও সন্ত্রাসী কেন ?

জবাব

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা ধর্ম সম্পর্কিত কোনো আলোচনা উঠলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ প্রশ্নটি মুসলমানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। সুপরিকল্পিত এ প্রচার, বিরামহীনভাবে প্রচারের প্রতিটি মাধ্যম থেকে আরো অসংখ্য মিথ্যা ও ভুল তথ্য সহকারে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে। কার্যত এই ধরনের ভুল তথ্য ও মিথ্যা রটনা মুসলমানদেরকে বর্বর হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই করা হয়।

ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরনের পরে আমেরিকান প্রচার মাধ্যমের মুসলিম বিরোধী প্রচারণার একটি প্রকৃষ্ট নমুনা পাওয়া গেছে। যেখানে এই আক্রমনের নেপথ্যে 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র' কাজ করেছে বলে সংবাদ মাধ্যম গুলোর ঘোষণা করে দিতে এতটুকু দেরী হয়নি। অথচ মূল অপরাধী হিসেবে পরবর্তীকালে যাকে সনাক্ত করা হয়েছে সে ছিল **'আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীরই একজন সৈনিক'**। আসুন এবার সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের অভিযোগ দুটি পর্যালোচনা করে দেখি।

ক. মৌলবাদী শব্দটির সংজ্ঞা

মৌলবাদী এমন এক ব্যক্তি যে অনুসরণ ও আনুগত্য করে তার চিন্তা বিশ্বাসের মৌলনীতি ও শিক্ষা সমূহকে। কেউ যদি ভালো ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং কঠোর অনুশিলনী চালাতে হবে ঔষধের মূল কার্যকারীতার ওপর। অন্য কথায় তাকে হতে হবে ঔষধী জগতের একনিষ্ঠ মৌলবাদী। একইভাবে কেউ যদি গণিতবেত্তা বা গণিতবীদ হতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে পারতে হবে এবং একাগ্র মনোযোগে অনুশিলনী চালাতে হবে গণিতের মূল সূত্রের ওপরে। অর্থাৎ তাকে হতে হবে গণিত শাস্ত্রের মৌলবাদী। একইভাবে কেউ যদি বিজ্ঞানী হতে চায় তাহলে তাকে জেনে নিতে হবে, বুঝতে হবে এবং গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হয়ে অনুশিলনী চালাতে হবে বিজ্ঞানের মৌলতত্ত্ব ও মূল সূত্রগুলোর ওপর। অর্থাৎ তাকে হতে হবে বিজ্ঞান জগতের মৌলবাদী।

খ. সব মৌলবাদী এক রকম নয়

সব মৌলবাদীর চিত্র যেমন একই তুলি দিয়ে আঁকা যাবে না। তেমনি ভালো কি মন্দ, হুট করে এরকম কোনো মন্তব্যও করা যাবে না। যে কোনো মৌলবাদীর শ্রেণী বিন্যাস নির্ভর করে তার কাজ ও সে কর্মের জগত নিয়ে। একটি মৌলবাদী ডাকাত বা চোর সমাজের জন্য ক্ষতিকর সুতরাং সে অনাকাঙ্ক্ষিত। অপরদিকে একজন মৌলবাদী চিকিৎসক সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

গ. একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত

আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় চেষ্টা করি ইসলামের মৌলনীতি সমূহকে অনুশীলন ক

কোনো মুসলিম একজন মৌলবাদী মুসলিম আখ্যায়ীত হতে আদৌ লজ্জিত হবে না। একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত এবং নিজেকে ধন্য মনে করি কারণ আমি জানি ইসলামের মৌলনীতি সমূহ বিশ্বমানবতার জন্য শুধুই কল্যাণকর। পৃথিবীর জন্য তা আশির্বাদ স্বরূপ। ইসলামের এমন একটি মূলনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যা বিশ্বমানবতার জন্য ক্ষতিকর অথবা সামগ্রীকভাবে মানুষের স্বার্থের প্রতিকূলে।

অনেক মানুষই ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষাকে অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক বলে আখ্যায়ীত করে। এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের অশুদ্ধ ও অপ্রতুল জ্ঞানের কারণে।

কেউ যদি মুক্তবুদ্ধি মুক্তমন ও ন্যায়পরায়ণ মনোবৃত্তি নিয়ে ইসলামের শিক্ষা সমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাহলে তারপক্ষে একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না যে, 'ইসলাম' ব্যক্তির স্বতন্ত্র পর্যায়ে অথবা সমাজের সামগ্রীক পর্যায়ে— মানবতার জন্য অফুরন্ত কল্যাণের এক অমিয় ঝর্ণাধারা।

ঘ. মৌলবাদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ

ওয়েবেষ্টারস ডিকশনারী অনুযায়ী "ফান্ডামেন্টালিজম" ছিল একটি আন্দোলনের নাম। যা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান বাদীরা গড়ে তুলেছিল। এটা ছিল আধুনিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং বাইবেলের নির্ভুল হওয়ার স্বপক্ষে কঠিন চাপ প্রয়োগ। তা শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়— সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির ক্ষেত্রেও। বাইবেলের ভাষা, আক্ষরীক অর্থেই তাদের গড এর—এভাবে 'মৌলবাদ' এমনই একটি শব্দ যা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছিল খ্রীস্টানদের একটি দলের জন্য যারা বিশ্বাস করতো 'বাইবেল' কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তিহীন, আক্ষরিক ভাবেই আল্লাহ্‌র কথা।

অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বর্ণিত 'ফাণ্ডামেন্টালিজম'-এর অর্থ— যে কোনো ধর্মের মৌলিক শিক্ষাসমূহকে কোনো শৈথীল্য বরদাস্ত না করে কঠোর অনুশীলন, লালন ও পালন করা। বিশেষ করে ইসলামের।

আজ যখনই কেউ 'মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার করে তার ভাবনায় চলে আসে একজন মুসলমান যে সন্ত্রাসী।

ঙ. প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়াই কাম্য

প্রত্যেক মুসলমানকেই একজন সন্ত্রাসী তো হওয়া উচিত। সন্ত্রাসী তো তাকেই বলে যে ত্রাস বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যখনই কোনো ডাকাত একজন পুলিশকে দেখে— সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য 'সন্ত্রাসী'। এভাবেই চোর-ডাকাত, ধর্ষণকারী, বদমাশ তথা সমাজ বিরোধী সকল দুষ্কৃতিকারীর জন্য একজন মুসলমানকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী হতে হবে। যখনই সমাজ বিরোধী কোনো বদমাশ একজন মুসলমানকে দেখবে সে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এমন এক লোকের জন্য যে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কাজেই একজন সত্যিকারের মুসলমান সন্ত্রাসী হবে অপরাধীদের জন্য— নিরীহ সাধারণ জনগণের জন্য নয়। বস্তুত একজন মুসলমানকে হয়ে উঠতে হবে নিরীহ জনসাধারনের সামনে শান্তি ও নিরাপত্তার অবলম্বন।

চ. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে— সন্ত্রাসী এবং দেশ প্রেমিক

ইংরেজদের গোলামী থেকে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করল তখন ভারত-মুক্তির অসংখ্য যোদ্ধা যারা গান্ধীবাদী অহিংসার পথকে সমর্থন করেনি। ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই একই ব্যক্তিত্বদের ভারতীয়রা সম্মানিত করেছে। আর সেই একই কর্মকাণ্ডের জন্য আখ্যা দিয়েছে 'দেশ প্রেমিক'।

এভাবেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া হয়েছিল একই লোকদেরকে একই কর্মকাণ্ডের জন্য। এক শ্রেণী যেখানে তাকে বলেছে একজন 'সন্ত্রাসী'। সেখানে অন্য শ্রেণী তাকে বলেছে 'দেশ প্রেমিক'। যারা বিশ্বাস করত ইংরেজদের অধিকার ছিল ভারত শাসন করার তারা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলত। আর যারা বিশ্বাস করত ইংরেজদের কোনো অধিকার নেই ভারত শাসন করার, তারা তাদেরকে বলত 'দেশ প্রেমীক' এবং 'মুক্তিযোদ্ধা'। কাজেই বিষয়টা হালকা করে গুরুত্বহীনভাবে দেখার কোনো উপায় নেই। কারো ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার আগে ভালো করে শুনে নিতে হবে উভয় পক্ষের যাবতীয় বক্তব্য। অবস্থা ও প্রেক্ষিতের

পর্যালোচনা করতে হবে। ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারপর বিচার করা যেতে পারে। এবং তারপর প্রশ্ন আসবে চূড়ান্ত মন্তব্যের।

ছ. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম শব্দের উৎপত্তি 'সালাম' থেকে। এর অর্থ শান্তি। একটা শান্তির জীবন ব্যবস্থা। যার মৌলিক নীতি সমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় গোটা পৃথিবীতে শান্তির শ্লোগান উচ্চকিত করতে এবং তা অর্জিত হলে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে।

প্রতিটি মুসলিম মৌলবাদী হবে। তাকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে শান্তির জীবন বিধান ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সমূহের। তাকে মূর্তিমান আতঙ্ক ও সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে হবে সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতিকারীদের সামনে। যাতে সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা দিন দিন বৃদ্ধি পায়— বজায় থাকে।

৬. আমিষ খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ একটি পশুকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। তাহলে মুসলমানরা কেন এতো পশু হত্যা করে, আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে।

জবাব

'নিরামিষবাদ' বিশ্বব্যাপী এখন একটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অনেকেই এমনকি এটাকে যুক্ত করেছে 'পশু অধিকারের' সাথে। সন্দেহ নেই জনগণের একটি বিশাল অংশ মনে করেন মাংস ভক্ষণ এবং অন্যান্য উৎপাদিত আমিষ দ্রব্যসামগ্রী 'পশু অধিকার' কে হরণ করে।

ইসলাম আদেশ করে সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার নীতি গ্রহণ করতে। একই সাথে ইসলাম এ বিশ্বাসও লালন করে যে, এ পৃথিবীর যাবতীয় ফুল-ফল তথা উদ্ভিদ ও পশুপাখি এবং জলজপ্রাণী, সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের জন্য। এর পরের দায়িত্ব মানুষের, এসব সম্পদ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত (বিশেষ অনুগ্রহ) ও আমানত সমূহের যথাযথ সংরক্ষণ তাদেরই দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

এ বিতর্কের সম্ভাব্য আরো কিছু দিক পর্যালোচনা করে নেয়া যাক।

ক. একজন মুসলিম সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীও হতে পারে

একজন মুসলমান সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়েও প্রথম শ্রেণীর মুসলিম থাকতে পারেন। এটা বাধ্যতামূলক কিছু নয় যে, একজন মুসলমানকে আমিষ খাদ্য খেতেই হবে।

খ. জ্যোতীর্ময় কুরআন মুসলমানদেরকে আমিষ খাবারের অনুমতি দেয়

মুসলমানদের পথ প্রদর্শক আল-কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত সমূহ তার প্রমাণ। বলা হচ্ছে ঃ

١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ۞

হে ঈমান ধারণকারীরা! পূরণ করো তোমাদের প্রতি সকল অর্পিত দায়িত্ব। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে (খাবার জন্য) সকল চতুষ্পদ জন্তু— অন্য কারো নামে তা জবাই করা না হয়ে থাকলে। (৫ঃ১)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۞

আর গৃহপালিত পশু তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যও গুলো থেকে তোমরা উষ্ণতা পাও (গরমের পোশাক) এবং আরো অসংখ্য উপকারী জিনিষ। আর সেগুলো (গোস্ত) তোমরা খাও। (১৬ ঃ ৫)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۞

আর গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শেখার মতো উদাহরণ। ওগুলোর দেহ-অভ্যন্তর থেকে আমরা এমন কিছু উৎপাদন করি (দুধ) যা তোমরা পান করো। ওগুলোর মধ্যে আরো অসংখ্য উপকার আছে তোমাদের জন্য আর ওগুলোর (গোস্ত) তোমরা খাও। (২৩ ঃ ২১)

গ. মাংস পুষ্টিকর এবং আমিষে ভরপুর

আমিষ খাদ্য প্রোটিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস। জৈবীক ভাবেই তা প্রোটিন

সমৃদ্ধ। আটটি অতি প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এসিড যা দেহের দ্বারা সমন্বিত হয় না। তাই খাদ্যের মাধ্যমে তা সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে আরো আছে লৌহ, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

ঘ. মানুষের দাঁত সব রকম খাদ্য গ্রহণে সক্ষম করে বিন্যস্ত

আপনি যদি পর্যবেক্ষণ করেন তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের বিন্যাস— যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি। আপনি দেখে আশ্চর্য হবেন যে, তা সব একই রকম। এসব পশুর দাঁত ভোঁতা (সমতল) যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। আপনি যদি লক্ষ্য করেন মাংসাশী পশুদের দন্ত বিন্যাস অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, লিউপার্ড, শৃগাল, হায়েনা ইত্যাদি— এগুলোর দাঁত ধারালো যা মাংসের জন্য উপযোগী। মানুষের দাঁত লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে সমতলের ভোঁতা দাঁত যেমন আছে তেমনি ধারালো এবং চোখা দাঁতও আছে। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। এক কথায় 'সর্বভূক'।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন মানুষ শুধু তরিতরকারী খাবে তাহলে আমাদের মুখে ধারালো দাঁত ক'টি দিলেন কেন ? এর দ্বারা এটাই কি প্রমাণিত হয়না যে, খোদ সৃষ্টিকর্তাই চান যে, মানুষ সব ধরনের খাবার গ্রহণ করুক।

ঙ. আমিষ ও নিরামিষ দুই ধরনের খাদ্যই মানুষ হজম করতে পারে

তৃণভোজী প্রাণির হজম প্রক্রিয়া শুধু তৃণ জাতীয় খাদ্যই হজম করতে পারে। মাংসাশী প্রাণির হজম প্রক্রিয়া পারে শুধু মাংস হজম করতে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া তৃণ ও মাংস উভয় ধরনের খাদ্যই হজম করতে সক্ষম।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা শুধু নিরামিষ ভক্ষণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে এমন হজম শক্তি দিলেন কেন যা দিয়ে তৃণ ও মাংস উভয় ধরনের খাদ্যই হজম করা যায় ?

চ. হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়

১. অসংখ্য হিন্দু রয়েছে যারা নিষ্ঠাবান নিরামিষ ভোজী। তারা আমিষ খাদ্যকে তাদের ধর্ম বিরোধী মনে করে। অথচ আসল সত্য হলো, হিন্দু শাস্ত্রই মাংস খাবার অনুমতি দিয়েছে। গ্রন্থসমূহ উল্লেখ করেছে— পরম বিজ্ঞ সাধু-সন্তরা আমিষ খাবার গ্রহণ করতেন।

২. হিন্দুদের আইনের গ্রন্থ 'মনুশ্রুতি' পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক ৩০-এ আছে— খাদ্য গ্রহণকারী যে খাবার খায়, সেই সব পশুর যা খাওয়া যায়, মন্দ কিছু করে না। এমনকি সে যদি তা করে দিনের পর দিন। ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন কিছু ভক্ষিত হবে আর কিছু ভক্ষণ করবে।

৩. মনুশ্রুতীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে আবার বলা হয়েছে— 'মাংস ভক্ষণ শুদ্ধ' উৎসর্গের জন্য। ঈশ্বরের বিধান হিসেবে বংশ পরম্পরায় তা জানা আছে।

৪. এরপরে মনুশ্রুতীর পঞ্চম অধ্যায় ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ "ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন— উৎসর্গের পশু উৎসর্গের জন্যই। সুতরাং উৎসর্গের জন্য হত্যা— হত্যা নয়।

৫. মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৮৮ অধ্যায় বর্ণনা করছে— ধর্মরাজ যুধিষ্টির ও পিতামহ ভীষ্ম, এদের মধ্যে কথোপকথন— কেউ যদি শ্রাদ্ধ করতে চায় তাহলে সে অনুষ্ঠানে কি ধরনের খাবার খাওয়ালে স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষ (এবং মাতাগণ) সন্তুষ্ট হবেন। যুধিষ্টির বলল, হে মহাশক্তির মহাপ্রভূ! কি সেই সব বস্তু সামগ্রী যাহা— যদি উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা প্রশান্তি লাভ করবে ? কি সেই বস্তু সামগ্রী যা (উৎসর্গ করলে) স্থায়ী হবে ? কি সেই বস্তু যা (উৎসর্গ করলে) চিরস্থায়ী হবে ?

ভীষ্ম বলছেন, তাহলে শোন হে যুধিষ্টীর! কী সেই সব সামগ্রী। যারা গভীর জ্ঞান রাখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পর্কে— যা উপযোগী শ্রাদ্ধের জন্য। আর কি সেই ফল-ফলাদি যা তার সঙ্গে যাবে। সীম বিচীর সাথে চাল, বার্লী এবং মাশা এবং পানি আর বৃক্ষমূল (আদা, আলু বা মূলা জাতীয়) তার সাথে ফলাহার। যদি স্বর্গীয় পিতৃদেবদের শ্রাদ্ধে দেয়া হয়। হে রাজা! তা হলে তারা এক মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৎস সহকারে আপ্যায়ন করলে স্বর্গীয় পিতৃকুল দুই মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। ভেড়ার মাংস সহকারে— তিন মাস। খরগোশ সহকারে চারমাস। ছাগ-মাংস সহকারে ৫ মাস। শুকর-মাংস সহকারে ছয় মাস। পাখীর মাংস দিয়ে আপ্যায়ীত করলে সাত মাস। হরিণের মধ্যে 'প্রিসাতা' হরিণ শিকার করে খাওয়ালে আট মাস এবং 'রুরু' হরিণ দিলে নয় মাস। আর গাভীর মাংস দিলে দশমাস। মহিশের মাংস দিলে তাদের সন্তুষ্টি এগারো মাস বজায় থাকে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গরুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে, বিশেষ করে বলা হয়েছে তাদের সন্তুষ্টি থাকে পুরো এক বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের

কাছে গরুর মাংসের মতোই প্রিয়। ভদ্রিনাসার (বড় ষাঁড়) মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে পিতৃপুরুষ বার বছর সন্তুষ্ট থাকেন। পিতৃপুরুষের মৃত্যু বার্ষিকি গুলোর যে দিনটিতে সে মারা গেছে সেই রকম একটি দিন যদি শুক্ল পক্ষের হয় আর তখন যদি গন্ডারের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করা যায়— স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যায়। 'কালাসকা' কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি আর লাল ছাগলের মাংস যদি দিতে পারো তা হলেও তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যাবে।

অতএব আপনি যদি চান আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যাক তাহলে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে হবে।

ছ. হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত

হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ তার অনুসারীদের আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। তথাপি অনেক হিন্দু নিরামিষ ভোজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটা এসেছে 'জৈন' ধর্ম থেকে।

জ. উদ্ভীদেরও জীবন আছে

বিশেষ কিছু ধর্ম খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র নিরামিষ খাবার বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। কারণ তারা জীব হত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী। যদি কেউ কোনো সৃষ্ট জীবকে হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যে এধরনের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বেছে নেবে।

অতীত কালের মানুষ মনে করত উদ্ভিদের প্রাণ নেই। অথচ আজ তা বিশ্ববাসীর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, উদ্ভীদেরও প্রাণ আছে। কাজেই সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী হয়েও জীব হত্যা না করার শর্ত পূরণ হচ্ছে না।

ঝ. উদ্ভীদ ব্যাথাও অনুভব করতে পারে

এর পরেও হয়তো নিরামিষ ভোজীরা বলবেন, প্রাণ থাকলে কি হবে উদ্ভীদ ব্যাথা অনুভব করতে পারে না। তাই পশু হত্যার চাইতে এটা তাদের কম অপরাধ। আজকের বিজ্ঞান পরিষ্কার করে দিয়েছে উদ্ভিদও ব্যাথা অনুভব করে কিন্তু তাদের সে আর্ত চিৎকার মানুষই শোনার ক্ষমতা রাখে না 20 Herts থেকে 2000 Herts এর ওপরে বা নীচের কোনো শব্দ মানুষের শ্রুতি ধারণ করতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর কিন্তু শুনতে পারে 40,000 Herts পর্যন্ত।

এজন্য কুকুরের জন্য নিরব 'হুইসেল' বানানো হয়েছে যার ফ্রীকোয়েন্সী 20,000 Herts এর বেশি এবং 40,000 Herts এর মধ্যে। এসব হুইসল শুধু কুকুর শুনতে পারে, মানুষ পারে না। কুকুর এ হুইসেল শুনে তার মালিককে চিনে নিতে পারে এবং সে চলে আসে তার প্রভুর কাছে।

আমেরিকার এক খামারের মালিক অনেক গবেষণার পর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে উদ্ভীদের কান্না মানুষের শ্রুতীযোগ্য করে তোলা যায়। সে বিজ্ঞানী বুঝে নিতে পারত, উদ্ভীদ কখন পানির জন্য চিৎকার করত। একেবারে এখনকার গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, উদ্ভীদ সুখ ও দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতেও।

ঞ. দু'টি ইন্দ্রীয়ানুভূতী কম সম্পন্ন প্রাণীকে হত্যা করা কম অপরাধ নয়

এবার নিরামিষ ভোজীরা তর্কে অবতীর্ণ হবেন যে, উদ্ভীদের মাত্র দু'টি অথবা তিনটি অনুভূতির ইন্দ্রীয় আছে আর পশুর আছে পাঁচটি। কাজেই পশু হত্যার চাইতে উদ্ভীদ হত্যা অপরাধের দিক থেকে কম।

ধরুন আপনার এক ভাই জন্মগত ভাবেই অন্ধ ও কালা। চোখে দেখেনা কানেও শোনেনা। অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় দুটি ইন্দ্রীয় তার কম। সে যখন পূর্ণ যৌবনে এসে পৌঁছাল তখন এক লোক নির্দয়ভাবে তাকে খুন করল। খুনী ধরা পড়ার পর— বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আপনি কি বিচারপতিকে বলবেন, মহামান্য আদালত খুনিকে আপনি পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শাস্তি দিন?

জ্যোতীর্ময় কুরআন বলেছে ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۞

হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে পবিত্র ও উত্তম (জিনিসগুলো) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করো। (২ঃ ১৬৮)

ট. পৃহপালিত পশুর সংখ্যাধিক্য

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি ফল-মূল তরিতরকারী ও শাক শব্জিকেই খাবার হিসাবে বেছে নেয় তা হলে গবাদী পশুর জন্য ভু-পৃষ্ঠ ছেড়ে দিয়ে মানুষকে অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বাস করতে হবে। আর খাল বিল নদী নালা ও সাগর মহাসাগর পানি শূন্য হয়ে যাবে মাছ ও অন্যান্য জ্বলজ প্রাণীর আধিক্যে। কেননা

উভয় শ্রেণীর জন্ম হার ও প্রবৃদ্ধি এত বেশি যে, এক শতাব্দী লাগবে না এ পৃথিবী তাদের দখলে চলে যেতে।

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করেই জানেন এবং বোঝেন। তাঁর সৃষ্টিকুলের ভারসাম্য তিনি কিভাবে রক্ষা করবেন। কাজেই এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, তিনি কি কারণে আমাদেরকে মাছ মাংস খাবার অনুমতি দিয়েছেন।

৭. পশু জবাই করার ইসলামীপদ্ধতি— দৃশ্যতঃ নির্দয়

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করে ?

জবাব

একটি বিরাট সংখ্যক মানুষের সমালোচনার বিষয় পশু জবাইয়ের ইসলামী পদ্ধতি। মুক্ত মনে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে প্রমাণ হয়ে যাবে জবাই পদ্ধতিটি শুধু মানবিকই নয় বৈজ্ঞানিকও বটে।

ক. পশু জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি

'যাক্কায়াতুম' একটি ক্রিয়া, উৎপন্ন হয়েছে মূল শব্দ 'যাকাহ্' থেকে (পবিত্র করতে)। এর ক্রিয়া ভাব প্রকাশক 'তায্কীয়াহ'। অর্থাৎ পবিত্রকরণ। ইসলামী পদ্ধতিতে একটি পশু জবাই করতে হলে নিম্নোদ্ধৃত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করতে হবে

অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুততার সাথে পশুটি জবাই করতে হবে যেন ওটা ব্যাথা কম পায়।

২. গলনালী, শ্বাশ নালী ও রক্তবাহী ঘাড়ের রগ কেটে ফেলতে হবে

'যাবীহাহ্' একটি আরবী শব্দ যার মানে 'জবাই করা হয়েছে'। যবাই করতে হবে গলা, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী রগগুলো কেটে। মেরুদণ্ডের তন্ত্রী (স্পাইনাল কড) কাটা যাবে না।

৩. শরীরের রক্ত প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে

দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার আগে দেহের সমস্ত রক্ত বের করে দিতে হবে। অধিকাংশ রক্ত বের করে দিতে হবে এই জন্য যে, তা ব্যাকটেরিয়া ও জীবানু ইত্যাদির নিরাপদ নিবাস ও বংশ বিস্তারের ক্ষেত্র কাজেই মেরুদন্ডের তন্ত্রী কিছুতেই কাটা যাবে না। কেননা হৃদযন্ত্রের দিকে যেসব স্নায়ু তন্তু রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে এসময়। যা হৃদপিন্ডের স্পন্দন থামিয়ে দেবার কারণ হবে। ফলে রক্ত নালীসমূহে রক্ত আটকা পড়ে যাবে।

খ. রক্ত, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়ার সহজ বাহন

জৈব-বিষ ব্যাকটেরিয়া ও রোগ-জীবানু ইত্যাদির সর্বোত্তম বাহক রক্ত। সুতরাং ইসলামী জবাই পদ্ধতি সাস্থ্যবিধি সম্মত। কেননা রক্ত, যার মধ্যে জৈব-বিষ, রোগ-জীবানু ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বেধে থাকে। যা অসংখ্য রোগ ব্যাধির কারণ হয়।

ঘ. গোস্ত বেশি দিন ভালো থাকে

পৃথিবীতে প্রচলিত খাদ্যের জন্য পশু হত্যার মধ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর মাংস বেশিদিন ভালো থাকে। কেননা তাতে রক্তের পরিমাণ থাকে নাম মাত্র।

ঙ. পশু ব্যাথা অনুভব করে না

ক্ষীপ্রতার সাথে গলনালীগুলো কেটে ফেললে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে রক্ত প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে রক্ত প্রবাহ ব্যাথ্যা বোধের কারণ। একারণে পশু ব্যাথ্যা বোধ করে উঠতে পারে না। মৃত্যুর সময় ওটা যে ছট্ ফট্ করে তা ব্যাথার জন্য নয় বরং রক্তের ঘাটতি পড়ে যাওয়ায় মাংসপেশির শৈথিল্য ও সংকোচনের জন্য এবং দ্রুত গতিতে দেহের বাইরে রক্ত বেরিয়ে যাবার কারণে।

৮. আমিষ খাদ্য মুসলমানদেরকে প্রচণ্ড উগ্র বানিয়ে ফেলে

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান আমাদের বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলমানদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

জবাব

ক. পশুর মধ্যে শুধু তৃনভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা আহার করে তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসাশী প্রাণী খাওয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে— এটা তার অন্যতম একটি কারণ। এ ধরনের হিংস্র প্রাণীর মাংস খেয়ে মানুষ হয়তো সত্যি সত্যিই হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার মতো শান্ত ও খুব সহজে পোষমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। বস্তুত এ কারণেই মুসলমানরা শান্তিকামী— শান্তিপ্রিয়।

খ. জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে— যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন যাবতীয় মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছু ভাল, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র। (৭ঃ১৫৭)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ج وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۞

রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকো। (৫৯-৭)

একজন মুসলমানের জন্য তাদের রাসূলের এই বার্তাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের মাংস খায়— যেখানে অন্য কিছু ধরনকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

গ. মাংসাশী প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বাণী

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বেশ কিছু সর্বসম্মত শুদ্ধ হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত মুসলিম শরীফের 'শিকার ও জবাই' অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহর ১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীস সমূহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (স) খেতে নিষেধ করেছেন ঃ

১. তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসাশী বন্য পশু প্রধানত বেড়াল ও কুকুর জাতীয় বাঘ, সিংহ, বেড়াল এবং শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ণ দন্তের অন্যান্য প্রাণী যেমন ইঁদুর, ন্যাংটি ইদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরিশ্রীপ জাতীয় প্রাণী যেমন সাপ কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখরওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেঁচা ইত্যাদি। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারে এমন কোনো বৈজ্ঞানীক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

৯. মুসলমানরা কা'বার পূজা করে

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যেখানে আকার বা মুর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করে সেখানে তারা নিজেরাই কেন তাদের প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

জবাব

কা'বা মুসলমানদের 'কেবলা'। মুসলমানরা তাদের প্রার্থনায় দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, মুসলমানরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে মুখ করে বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার। জ্যোতীর্ময় কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۞

তোমার (নির্দেশনার জন্য) বার বার আকাশের দিকে মুখ করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমরা কি তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে ? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমার মুখ সেই মাসজিদুল হারামের দিকে (এখন থেকে) যেখানেই তোমরা থাকনা কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ক. ইসলাম চূড়ান্ত ঐক্যকে উৎসাহিত করে

যেমন, মুসলমানরা যদি নামায আদায় করতে চায় তাহলে এমনটা হতেই পারে যে, কারো ইচ্ছা হবে উত্তর দিকে ফিরে নামায পড়তে, কারো ইচ্ছা হবে দক্ষিণ দিকে ফিরতে। তাই উপাসনার ক্ষেত্রেও মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যেখানেই তারা থাকনা কেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি এক মুখী হয়ে তাদের নামায আদায় করতে বলা হয়েছে। 'কাবা' সেই একটি দিকের দিক-নির্দেশক, অন্য কিছুই নয়। কাবার পশ্চিমাঞ্চলে যে মুসলমানরা বাস করে তারা মুখ করবে পূর্ব দিকে আর তার পূর্বাঞ্চলে যারা বাস করে তারা মুখ করবে পশ্চিম দিকে। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা উত্তর দিকে।

খ. পৃথিবী গোলকের কেন্দ্রবিন্দু কা'বা

মুসলমানরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল। তাদের চিত্রে দক্ষিণ ছিল ওপর দিকে আর উত্তর ছিল নিচের দিকে। তখন কা'বা ছিল কেন্দ্র বিন্দুতে। পরবর্তিকালে পশ্চিমা মানচিত্রকররা পৃথিবীর যে মানচিত্র আঁকলো তাতে ওপর দিকটা নিচে আর নিচের দিকটা ওপরে অর্থাৎ উত্তর হলো ওপরের দিকে আর দক্ষিণ হলো নিচের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ এ ক্ষেত্রেও "কাবাই মানচিত্রের কেন্দ্র বিন্দু থেকে গেল"।

গ. কা'বাকে ঘিরে তওয়াফ করা আল্লাহ্‌র একত্বের নির্দেশক

মুসলমানরা কা'বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে 'তাওয়াফ' করে। অর্থাৎ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহ বিশ্বাস ও

উপাসনার নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার এবং তার একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য আল্লাহ্— মাত্র একজনই, এটা তারই অন্যতম নিদর্শন।

ঘ. হযরত উমর (রা) এর হাদীস

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কিত হযরত উমর (রা) এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে 'আছার' বা ঐতিহ্য বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীস, উমর (রা) বলছেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথরখণ্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম খোদ আল্লাহ্র রাসূল (স) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।"

ঙ. মানুষ কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল

রাসূলুল্লাহ (স) এর সময়ে লোকেরা কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিত। মুসলমানরা কা'বা ঘরের উপাসনা করে বলে যারা মনে করেন তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন মুর্তী-পূজারী, যে মুর্তী সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায় ?

১০. অমুসলিমদের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্ন ঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন ?

জবাব

একথা সত্য যে, আইনত মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশানুমতি নেই। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এই নিষিদ্ধতার নেপথ্য কারণগুলো উদ্ঘাটনে সহায়ক হবে।

ক. সেনানিবাস এলাকায় সকল নাগরিক প্রবেশানুমতী পায় না

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও এদেশের এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে আমার অবাধে প্রবেশানুমতী নেই। যেমন সেনানিবাস। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই সাধারণ নাগরিক প্রবেশ করতে পারবে না এমন সব এলাকা

রয়েছে। শুধু মাত্র সেনাবাহিনীর সদস্য এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ সে সব এলাকায় প্রবেশানুমতি পায়।

একইভাবে ইসলাম সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। মক্কা ও মদীনা এ দু'টি পবিত্র নগরিকে ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট ধরা যেতে পারে। এখানে শুধু যারা তার অনুসারী এবং এর প্রতিরক্ষার সাথে জড়িত তারাই প্রবেশানুমতি পায় অর্থাৎ মুসলমানরা। সেনানিবাস এলাকায় সাধারণ নাগরিকের প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছেই অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে। একই ভাবে কোনো অমুসলিমের মক্কা-মদীনায় প্রবেশাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা সঙ্গত বলে বিবেচিত নয়।

খ. মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের 'ভীসা'

১. যখনি কেউ অন্য কোনো দেশে ভ্রমন করতে চায়। প্রথমে তাকে সেদেশের 'ভিসা' পাবার জন্য আবেদন করতে হয়। অর্থাৎ সে দেশে প্রবেশের অনুমতি। প্রতিটি দেশের এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ আইন,' নীতিমালা এবং কিছু শর্ত রয়েছে। এসব কিছু পূরণ না হলে তারা 'ভিসা' দেবে না।

২. ভিসা দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিনভাবে রক্ষণশীল দেশগুলোর মধ্যে সবার ওপরে আমেরিকা। বিশেষ ভাবে তৃতীয় বিশ্বের কোনো নাগরিককে ভিসা দেবার জন্য তাদের আছে অসংখ্য নিয়ম কানুন। আরো আছে দুর্লভ ও দুরূহ শর্তসমূহ যা সাধারণের আয়ত্বাধীন নয় কোনো ভাবেই।

৩. আমি সিঙ্গাপুর ভ্রমনে গিয়েছিলাম। তাদের অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন ফর্মে উল্লেখ ছিল— মাদক দ্রব্য বহনকারীর জন্য "মৃত্যুদণ্ড"। এখন সিঙ্গাপুরে প্রবেশানুমতি চাইলে আমাকে তাদের যে আইন তা মেনেই নিতে হবে। আমি তো আর বলতে পারি না 'মৃত্যুদণ্ড' মধ্যযুগীয় নৃশংস বর্বরদের শাস্তি। তাদের সব নিয়ম-কানুন এবং শর্তগুলোকে যদি আমি মেনে নেই কেবলমাত্র তখনই আমার পক্ষে সে দেশের প্রবেশানুমতি পাওয়া সম্ভব।

৪. 'ভিসা'— পৃথিবীর যে কোনো মানুষের জন্য মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের অনুমতি পেতে হলে সর্ব প্রথম যে শর্তটি পূরণ করতে হবে তা হলো তার মুখে বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ "মানা যায় এমন কেউ নেই কিছু নেই আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল"।

১১. শুকর মাংস নিষিদ্ধ

প্রশ্ন ঃ ইসলামে শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কেন ?

জবাব

এটা সর্বজন বিদিত যে, শুকর মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এই নিষিদ্ধতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবে।

ক. কুরআনে শুকর মাংসের নিষিদ্ধতা

শুকরের মাংস খাওয়া নিষেধ সম্পর্কে অন্তত চারটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ২ঃ১৭৩, ৫ঃ৩, ৬ঃ১৪৫, এবং ১৬ ঃ ১১৫।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

"নিষিদ্ধ করা হলো তোমাদের জন্য (খাদ্য হিসেবে) মৃত জন্তুর মাংস, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং এমন (জন্তুর মাংস) যা (জবাই করার সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। (৫ ঃ ৩)

শুকরের মাংস কেন নিষেধ করা হয়েছে তার সন্তোষজনক উত্তরের জন্য কুরআনের উল্লেখিত আয়াত সমূহই যথেষ্ট।

খ. বাইবেলে শুকর মাংস ভক্ষণের নিষিদ্ধতা

একজন খ্রীস্টান তার ধর্মগ্রন্থ সমূহের উল্লেখ দেখে সন্তুষ্ট হলে দেখতে পাবে যে, বাইবেলের 'লেভীটিকাস' গ্রন্থে শুকরের মাংস খেতে নিষেধ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

এবং শুকর, যদিও তার খুর দ্বিখন্ডিত এবং খুরযুক্ত পদ বিশিষ্ট। এমন কি সে চিবিয়ে খায়, যাবর কাটেনা। (তবু) ওটা অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র) তোমার জন্য"।

একই গন্থের ১১ অধ্যায় ৭ ও ৮ স্তবকে বলা হয়েছে ঃ

ওগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শও করবে না, ওগুলো 'অপবিত্র' তোমার জন্য।

বাইবেলের পঞ্চম গ্রন্থ 'ডিউট্যারনমী'তেও শুকর মাংস 'অপবিত্র' বলা হয়েছেঃ

"আর শুকর— কারণ তার খুর দ্বিখণ্ডিত, এমনকি চিবিয়ে খায়, যাবর কাটেনা, ওটা অপবিত্র তোমার জন্য, তুমি ওগুলোর মাংস খাবে না, না ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে। (ডিউট্যারনমী ঃ ১৪ঃ৮)

বাইবেলের 'আইযায়াহ, গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায় ২ থেকে ৫ স্তবকেও একই নিষিদ্ধতা

গ. শুকর মাংস ভক্ষণ বেশ কিছু মারাত্মক রোগের কারণ

অন্যান্য অমুসলিম ও নাস্তিকরা হয়তো উপযুক্ত কারণ ও বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মেনে নিতে পারে— শুকর মাংস ভক্ষণ কমপক্ষে সত্তুরটি রোগের উদ্ভব ঘটাতে পারে। প্রথমত ঃ আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন প্রকার ক্রিমির দ্বারা। যেমন বৃত্তাকার ক্রিমি, ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত ক্রিমি এবং বক্র ক্রিমি। এর মধ্যে সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক হলো 'টাইনিয়া সোলিয়াম'। সাধারণভাবে যেটাকে 'ফিতা ক্রিমি' বলা হয়। এটা পেটের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং অনেক লম্বা হয়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং দেহের প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে, যদি এটা মস্তিস্কে ঢোকে, তাহলে কারণ ঘটাতে পারে স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়ে যাবার। হৃদ-যন্ত্রের মধ্যে ঢুকলে বন্ধ করে দিতে পারে হৃদযন্ত্রক্রিয়া। চোখে ঢুকতে পারলে অন্ধত্বের কারণ, কলিজীতে ঢুকতে পারলে সেখানে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে অর্থাৎ এটা শরীরের যে কোনো অঙ্গ-পত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এরপরও আছে আরো ভয়ঙ্কর 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস'। এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হলো ভালো করে রান্না করলে এর ডিম্ব মারা যায়। এর ওপরে আমেরিকায় গবেষণা চালানো হয়েছে। ফলাফল ভালো করে রান্না করার পরও প্রতি ২৪ জনের ২২ জন এই 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস' দ্বারা আক্রান্ত। প্রমাণিত হলো সাধারণ রান্নায় এ ডিম্ব ধ্বংস হয় না।

ঘ. শুকর মাংসে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর

শুকর মাংসে পেশী তৈরীর উপাদান অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ। পক্ষান্তরে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর। এ জাতীয় চর্বি বেশিরভাগ রক্ত নালীতে জমা হয়— যা কারণ ঘটায় হাইপার টেনশান এবং হার্ট এ্যাটাকের। অবাক হবার কিছু নেই যে ৫০% ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশানের রুগী।

ঙ. পৃথিবীর বুকে শুকর নোংরা ও পঙ্কিলতম প্রাণী

এ প্রাণীটি বসবাস করতে সাচ্ছন্দ বোধ করে নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও ময়লাপূর্ণ জায়গায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমাজবদ্ধ সৃষ্টি কূলের ধাঙর, মেথর বা ময়লা পরিষ্কারক হিসাবেই বোধকরি এ প্রণীটি সৃষ্টি করেছেন। আজ থেকে পঞ্চাস কি ষাট বছর আগেও যখন সেনিটারী পায়খানা আবিষ্কৃত হয়নি তখন যে কোনো শহরের পায়খানার ধরন ছিল, পেছন থেকে মেথর এসে তা ট্যাঙ্কি ভরে নিয়ে যেত এবং শহরের উপকণ্ঠে কোথাও ফেলতো। যা ছিল শুকরদের পরম আনন্দ নিবাস এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলোই সব বিষ্ঠার রূপান্তর ঘটতো।

অনেকেই হয়তো এখন বিতর্কে নেমে পড়বেন উন্নত বিশ্বে এখন শুকরের পরিচ্ছন্ন খামার করা হয়েছে যেখানে ওগুলো লালিত পালিত হয়। তাদের এই অনেক উন্নত, স্বাস্থ্যকর খামারেও ওগুলো গাদাগাদি করেই রাখা হয়। ওদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার যত চেষ্টাই করা হোক না কেন প্রকৃতিগত ভাবেই ওগুলো নোংরা। অত্যন্ত আনন্দের সাথেই ওরা ওদের নিজেদের ও সঙ্গিদের বিষ্ঠা নিয়ে ওদের চোখা নাক দিয়ে নাড়া চাড়া করে আর উৎসবের খাদ্য হিসেবেই খায়।

চ. শুকর নির্লজ্জতায় জঘন্য পশু

ভু-পৃষ্ঠের ওপরে শুকর অশ্লীলতায় নির্লজ্জতম প্রাণী। একমাত্র পশু যেটা তার স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে সংগম করার জন্য অন্যান্য পুরুষ-সঙ্গীদের ডেকে নেয়। আমেরিকার ও ইউরোপর অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য শুকর মাংস। খাদ্যভ্যাস আচরণে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা ওরাই। ওদের প্রিয় সংস্কৃতি ডান্স পার্টি গুলোতে নেচে নেচে উত্তেজনার উত্তুঙ্গে উঠে একে অপরের সাথে 'সোয়া'র জন্য বউ বদল করে নেয়। অনেকেই আবার জীবন্ত নীল ছবি চোখে দেখার জন্য স্ত্রীর সাথে সংগম করতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নেয়। তারপর এক নারী নিয়ে চলে অনেক পুরুষের সম্মিলিত লীলাখেলা। ধন্য উন্নত বিশ্ব, ধন্য তার সর্বোন্নত সংস্কৃতি।

১২. মদ্য পানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ঃ ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন ?

জবাব

স্মরণাতীত কাল থেকে বিশ্বমানবতার জন্য 'এ্যালকোহল' তীব্র যন্ত্রণার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মদ অসংখ্য অগুনতী মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ। মানুষের সমাজে অসংখ্য সমস্যার নেপথ্যে আসল হেতু এই 'ত্র্যালকোহল' বা মদ। অপরাধ প্রবনতার তীব্র উর্ধগতী, ক্রমবর্ধমান মানসিক বিপর্যয় এবং কোটি কোটি ভাঙা সংসার জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে বিশ্ব জুড়ে এ্যালকোহলের নিরব ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা কি ভাবে চলছে।

ক. কুরআনে মদ্য পানের নিষিদ্ধতা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা! মদ ও জুয়া, পাশা খেলা, তীর ছুঁড়ে ভাগ্য জানা এগুলো শয়তানের নিকৃষ্ট ধরনের জঘন্য কারসাজি। এসব পরিহার করো যেন তোমরা উন্নত (মানবতার) পথে এগিয়ে আসতে পারো।

(৫ঃ ৯০)

খ. বাইবেলে মদের নিষিদ্ধতা

১. মদ্য একটি প্রতারক, কঠিন পানীয়, কুৎসীত কাজের উৎসাহক এবং যে এতে অভ্যস্ত হলো সে মুর্খতায় নিমজ্জিত হলো। (বাইবেলের নীতিবাক্য, মূল গ্রন্থ ঃ ২০-১)

২. আর মদ্য পানে মাতাল হয়ো না। (এফিসিয়ানেস ঃ ৫ঃ১৪)

গ. এ্যালকোহল বিবেককে বাধাগ্রস্ত করে

মানুষের মগজে একটি বিবেচনা কেন্দ্র আছে। এ বিবেচনা কেন্দ্র মানুষকে সেই সব কাজ করতে বাধাগ্রস্থ করে, যেসব কাজ সে মন্দ বলে জ্ঞান করে।

যেমন কোনো লোক সাধারণত তার পিতা-মাতা এবং গুরুজনের সাথে কথা বলার সময় অসম্মানজনক ভাষা ব্যাবহার করে না। তাকে যদি কখনো প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয় (পায়খানা পেশাব) তার বিবেচনা কেন্দ্র তাকে বাধা দেবে জনসমক্ষে এ কাজ করতে। এ জন্য সে গোপন জায়গা ব্যাবহার করে।

মানুষ যখন মদ পান করে, তখন তার মগজের এই বিবেচনা কেন্দ্র স্থবীর হয়ে পড়ে (অর্থাৎ নিজেই কাজ করতে বাধাগ্রস্ত হয়)। মদ্য পানে মাতাল ব্যক্তিকে যে অস্বাভাবিক আচার আচরণ করতে দেখা যায় তার সুনির্দিষ্ট কারণ এটাই। যেমন মাতাল লোককে অসম্মানজনক কথা বলতে দেখা যায়, এমনকি সে যদি তার পিতা-মাতার সাথেও কথা বলতে থাকে। কেননা সে তখন তার এই ভুলকে উপলব্ধি করতেই সক্ষম হয় না। মাতাল হয়ে অনেকেই পেশাব করে দেয় তাদের কাপড়ে। না তখন সে ঠিক মতো কথা বলতে পারে, না পারে সোজা পায়ে হাঁটতে।

ঘ. ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিসিদ্ধ আত্মিয়ার সাথে জোরপূর্বক যৌনতা এই সবকিছু মদ্যপায়ীদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়।

আমেরিকার ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর ন্যাশনাল ভিকটিমাইযেশান সারভে ব্যুরো অব জাষ্টিস-এর পরিসংখ্যানে শুধু মাত্র ১৯৯৬ সালে প্রতিদিন গড়ে ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, রিপোর্টের মন্তব্যে বলা হয়েছে ধর্ষকদের অধিকাংশই ঘটনার সময় মাতাল ছিল, নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রেও এদেরকেই বেশি পাওয়া যায়।

একই পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৮% আমেরিকান মা-বোন, আথবা কন্যার সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত। অর্থাৎ প্রতি বারো বা তেরো জনের একজন আমেরিকান এই কর্মে অভ্যস্ত এবং দু'জনের একজন অথবা উভয়ে এসময় মাতাল থাকে। এইড্স বিস্তারের ক্ষেত্রে মাদকের ভূমিকা কান ও মাথার মতো (অর্থাৎ কান টানলে মাথা আসে) তাই মাদকাসক্তিই মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

ঙ. প্রতিটি মদাসক্ত লোকই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখীন পানকারী থাকে

অনেকেই মদের পক্ষ অবলম্বন করে বলবেন, ভাই পার্টি-পরিবেশে একটু আধটু হলে ভালোই লাগে। আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। এক কি দু'পেগ। আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখি, আমরা মাতাল হইনা কখোনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল এই যে, প্রত্যেকটি মদ্যপ মাতালই প্রাথমীক পর্যায়ে সৌখীন পানকারী ছিল। এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে মদ্যপ বা মাতাল হয়ে যাবার জন্য মদ পান শুরু করেছিল। অপরদিকে কোনো সৌখীন মদ পানকারীই একথা বলতে পারবেনা যে, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন যাবত এভাবেই দু'এক পেগ করেই খেয়ে এসেছি। কোনো দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাইনি। আর মাতাল হলে কেমন লাগে সে স্বাদও পাইনি।

চ. জীবনে একবারও যদি কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কোনো কাজ করে থাকে সে স্মৃতি তাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোগাবে।

ধরুন, কোনো সৌখীন সামাজিক মদপানকারী, জীবনে মাত্র একবার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতাল হয়েছিল। আর সেই দিনই তার দ্বারা ধর্ষণ বা আপনজন কারো ওপরে যৌন অত্যাচার মূলক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যদি সে, সেই কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে তবু সুস্থ ও স্বাভাবিক একজন মানুষকে সারাজীবন সেই স্মৃতির কুৎসীৎ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে— যে করেছে সে এবং যার ওপর তা সংঘটিত হয়েছে সে— উভয়কেই এই অপূরণীয় ও অপরিবর্তনীয় ক্ষতির ভোগান্তি পোহাতে হবে।

ছ. হাদীসে মদের নিষিদ্ধতা

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

১. মদ সকল মন্দ ও অশ্লীলতার মা (উৎস) এবং যাবতীয় মন্দের মধ্যে ওটা সবচাইতে লজ্জাকর। সুনানে ইবনে মাজাহ্ অধ্যায় ৩০। হাদীস নং ৩৩৭১।

২. এমন কিছু, যা নেশাগ্রস্ত করে অনেক পরিমাণে তা নিষেধ (হারাম)। এমনকি তা অল্প পরিমাণ গ্রহণ করা হলেও। তাই এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। তা এক ঢোক অথবা এক ড্রাম।

৩. হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মদের সাথে জড়িত এমন দশ শ্রেণীর লোকদের ওপরে আল্লাহ্র অভিশাপ। (১) যারা তা তৈরী করে (২) যাদের জন্য তা বানানো হয় (৩) যারা তা পান করে। (৪) যারা তা বহন করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায় (৫) যাদের জন্য তা নিয়ে আসা হয় (৬) যারা তা পরিবেশন করে। (৭) যারা তা বিক্রি করে

(৮) যারা তা বিক্রি লব্ধ টাকা ব্যাবহার করে (৯) যারা তা কেনে এবং (১০) যারা তা কেনে অন্য আর একজনের জন্য।

ছ. মদ্যপায়ীরা যে সব রোগে আক্রান্ত হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে এমন বেশ কিছু রোগের উৎপত্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যেসব রোগে সাধারণত মদ্যপায়ীরাই অক্রান্ত হয়। মদ এমন একটি কারণ, যে কারণে সারা বিশ্বে মৃত্যের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদ পানের কারণে পৃথিবী থেকে অকালে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সাধারণত মদ্যপায়ীরাই আক্রান্ত হয় এমন অতি পরিচিত কিছু রোগের একটি ছোট্ট তালিকা দেয়া হলো ঃ

১. যকৃৎ বা কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া। যা লিভার সিরোসিস নামে পরিচিত।

২. অম্লনালীর ক্যান্সার এবং মাথা, গলা, কলিজা ও মল নালীর ক্যান্সার।

৩. অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের প্রদাহ।

৪. হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বা হৃদয় স্পন্দন সংক্রান্ত যাবতীয রোগ, হাইপার টেনশান।

৫. হৃৎপিন্ডে রক্ত সঞ্চালেন নালী সমূহের যাবতীয় রোগ, গলনালী প্রদাহ এবং হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৬. পক্ষাঘাত, সন্যাস রোগ এরকম আরো অন্যান্য প্যারালাইসিস।

৭. স্নায়ু ও মস্তিষ্কের যাবতীয় রোগ।

এরকম আরো অসংখ্য— বাংলা ভাষায় যেসবের নামকরণ বেশ কষ্টসাধ্য। একারণে তালিকাও এখানেই ইতি টানা হলো।

জ. মাদকাসক্তিই একটি রোগ

চিকিৎসা বিজ্ঞানিরা মদ্যপায়ীদের ব্যাপারে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তারা এটাকে এখন আর নেশা বলেন না, বলেন এটা নিজেই একটা রোগ। 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' একটা পোষ্টার বের করেছে, তাতে বলা হয়েছে যদি 'মদই' রোগ হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে এটাই একমাত্র রোগ যা সুন্দর সুন্দর বোতলে ভরে বিক্রি হয়।

ঃ পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের মতো প্রচার মাধ্যমে তার বিজ্ঞাপন করা হয়।

ঃ সরকারের জন্য রাজস্ব আমদানী করে।

ঃ মৃত্যুকে যে প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে আসে।

ঃ পারিবারিক জীবন ধ্বংস ও অপরাধ প্রবণতার আসল হোতা।

মদ শুধু একটি রোগই নয়— শয়তানের কারসাজি এটা

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর সর্বোত্তম অনুগ্রহ আল-কুরআনে শয়তানের পাতা এই লোভনীয় ফাঁদ সম্পর্কে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বিদ্ধৃত জীবন যাপন পদ্ধতিতে 'দ্বীনুল ফিৎরাহ' বা মানুষের প্রকৃতিসম্মত জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম' বলা হয়। এর সকল বিধি-নিষেধের আসল উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতিকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা। মদ মানুষকে তার প্রকৃতগত স্বভাবের ওপর দাঁড়াতে দেয় না। একথা স্বতন্ত্র কোনো ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য তেমনি বৃহত্তর কোনো সমাজের ক্ষেত্রেও। এটা মানুষকে নিচে নামিয়ে পশুর পর্যায়ে নিয়ে আসে অথচ মানুষ দাবি করে যে, সে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম। সর্বোপরি ইসলামে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ "হারাম"।

১৩. সাক্ষীদ্বয়ের সমতা

প্রশ্ন ঃ কেন দু'জনের সাক্ষী, যারা নারী— সমতূল্য মাত্র একজনের, যে পুরুষ ?

জবাব

ক. একজন পুরুষ সাক্ষীর বিকল্প দুজন নারীর সাক্ষী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সাক্ষী প্রদান প্রসঙ্গে কুরআনের কমপক্ষে তিনখানি আয়াত রয়েছে যেখানে পুরুষ ও নারীর পার্থক্য করা হয়নি।

১. উত্তরাধিকারের ওসীয়ত করার সময় সাক্ষী হিসেবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا

عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ

হে ঈমান ধারণকারীরা ! তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছায় তখন অসীয়ত করতে হলে তোমাদের মধ্য থেকে সাক্ষী রেখো। তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অথবা বাইরের, যখন তোমরা এ পৃথিবীর বুকে (কোথাও) সফরে আছো, আর এমন সময় মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে। (সূরা মায়েদা ঃ ১০৬)

২. তালাকের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে।

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

এবং স্বাক্ষীর জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নাও। আর প্রতিষ্ঠিত করো এ সাক্ষী শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। (সূরা তালাক ঃ ২)

৩. নারীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে— চারজন সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

আর যারা পবিত্র চরিত্রের নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনবে। তারপর চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না (অভিযোগ প্রমাণের জন্য)। তাহলে তাদেরকে আশিবার বেত্রাঘাত করো। আর কোনো দিন তাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর এসব লোক তারাই যারা ফাসেক। (সূরা নূর ঃ ৪)

খ. টাকা পয়সা লেন-দেনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষীর প্রয়োজন

একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষী সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একথা সত্য নয়। এর সত্যতা শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সাক্ষী প্রসঙ্গে কুরআনে পাঁচ খানি আয়াত আছে যেখানে নারী কিংবা পুরুষ আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। আর একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষীর কথা মাত্র একখানি আয়াতে বলা

হয়েছে। সূরা বাকারা ২৮২ আয়াত। আয়াত খানির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত এবং তা ব্যাবসা ও টাকা-পয়সা লেন-দেন সংক্রান্ত।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ..... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى

হে ঈমানদারগণ! যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে লেন-দেন করো। তাহলে তা লিখে নিও ..... অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দু'জন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও যাদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দু'জন নারী বেছে নাও যেন একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। (সূরা বাকরা ঃ ২৮২)

এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তির আদেশ করা হয়েছে এবং সেখানে দু'জন সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। আর সে দু'জনই পুরুষ হতে হবে। কিন্তু যদি সে রকম আস্থাভাজন দু'জন পুরুষ মানুষের ব্যাবস্থা না করা যায় কেবল তখন, অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা থাকতেই হবে।

এখানে একটা উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। ধরা যাক কেউ একজন তার একটি বিশেষ রোগের জন্য অপারেশন করতে মনস্থ করেছে। মোটামুটি নিশ্চিত হবার জন্য সে সমমানের দু'জন শল্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। কোনো কারণে যদি দু'জন সার্জনের ব্যবস্থা করতে সে ব্যর্থ হয় তখন বিকল্প হিসেবে একজন সার্জন এবং দু'জন সাধারণ এম বি বি এস-এর পরামর্শ গ্রহণ করল।

একই ভাবে ব্যবসা ও ঋণ লেন-দেনের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। ইসলাম চায় পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য উপার্জনের দায়ভার পুরুষ বহন করুক। অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব যেখানে পুরুষের কাঁধে ন্যাস্ত। পৃথিবীতে প্রচলিত সাধারণ বাস্তবতাও তাই। কাজেই অর্থনৈতিক লেন-দেনে নারীর তুলনায় পুরুষই সুদক্ষ।

বিকল্প হিসেবে যে, একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর কথা বলা হয়েছে। তার কারণও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, একজন যদি কোনো ভুল করে তাহলে

আর একজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কুরআন এখানে শব্দ ব্যাবহার কারেছে 'তা'দিল' যার মানে তালগোল পাকিয়ে ফেলা। অথবা ভুল করা। অনেকেই শব্দটির তরজমা করেছেন 'ভুলে যাওয়া' এটা শুদ্ধ নয়। যা হোক আর্থিক লেনদেনই একমাত্র বিষয় যেখানে সাক্ষী হিসাবে একজন পুরুষের বিকল্প দু'জন নারী।

গ. হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষের বিকল্প দু'জন নারী

কিছু ইসলামী আইন-শাস্ত্রবীদগণের মতে, হত্যা মামলার সাক্ষী দানের ক্ষেত্রে নারীসুলভ অভিব্যক্তি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এধরনের পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী বেশি মাত্রায় ঘাবড়ে যেতে পারে। তার নারী সুলভ ভাবাবেগ তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিতে পারে। এ কারণেই কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম খুনের মামলায় 'একজন পুরুষের বিকল্প হিসেবে দু'জন নারীর সাক্ষী' এই রায় দিয়েছেন। অন্য সব ব্যাপারেই একজন নারীর সাক্ষী এক জন পুরুষের সাক্ষীর সমান মূল্যমানের।

ঘ. কুরআন সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে— একজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সমান

কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম যদিও এ ব্যাপারে জোরালো মতামত দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষীর বিকল্প দু'জন নারীর সাক্ষী, বিষয়টা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু নির্দ্বিধায় একথা মেনে নেয়া যায় না। কেননা খোদ কুরআনেই তা সমান করে দিয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

আর যারা তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে অথচ তাদের কাছে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষদাতা নেই। তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্যই চার বার (আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বললে) গ্রহণ যোগ্য হবে। (সূরা নূর ঃ ৬)

ঙ. হযরত আয়শা (রা)-এর একক সাক্ষী হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য

মুসলমানদের কাছে কুরআনের পরেই নির্দেশনার জন্য মূল্যবান যে উৎস সেই হাদীস সমূহের মধ্যে হযরত আয়শা (রা) বর্ণিত ২২২০ খানা হাদীস শুধু মাত্র তাঁর একক সাক্ষীর ওপরেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ। কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী একজন নারীর সাক্ষীই যে গ্রহণযোগ্য, এর জন্য আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়েনা।

ইসলামী আইন-শাস্ত্রবীদগণের অনেকেই এব্যাপারে একমত যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন 'মো'মেনা' নারীর স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। বিষয়টা অবশ্যই ভেবে দেখার মতো। ইসলামের একটি স্তম্ভ 'রোযা'র কার্যকরিতার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠি একজন মাত্র নারীর সাক্ষী দানের ওপরেই নির্ভর করতে পারে।

কোনো কোনো ইসলামী পণ্ডিত বলেছেন, রমযানের চাঁদ দেখার জন্য একজন সাক্ষী এবং রমযানের শেষের চাঁদ অর্থাৎ ঈদের চাঁদ দেখার জন্য দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষীগণের পুরুষ বা নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

চ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষী অগ্রগণ্য

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীর সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য, সেখানে পুরুষের কোনো ভূমিকাই নেই। যেমন কোনো মহিলার মৃতদেহের গোসল করানোর সাক্ষী একজন নারীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব।

দৃশ্যত সাক্ষীদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তা আদৌ লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য নয়। তা বরং ইসলামের বিবেচনায় সমাজে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে।

১৪. উত্তরাধিকার

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারী সম্পদে একজন নারীর অংশ একজন পুরুষের অর্ধেক কেন ?

জবাব

ক. কুরআনে উত্তরাধিকার

যথাযোগ্য প্রাপকদের মধ্যে উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টনের সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত নির্দেশনা জ্যোতীর্ময় কুরআনে বিধৃত আছে।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কুরআনী আয়াত সমূহ ঃ

সূরা বাকারা ঃ ১৮০

সূরা বাকারা ঃ ২৪০

সূরা নিসা ঃ ৭-৯

সূরা নিসা ঃ ১৯

সূরা নিসা ঃ ৩৩

সূরা মায়েদাহ ঃ ১০৬-১০৮

খ. আত্মীয় স্বজনের জন্য উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট অংশ

কুরআনের তিনখানি আয়াতে বিস্তারিতভাবে নিকটাত্মীয়দের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ز لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ ج لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ ط كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ

اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন ঃ পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। (উত্তরাধিকারী) যদি দুই জনের বেশি নারী হয় তাহলে তাদেরকে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন নারী হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সে যদি নিঃসন্তান হয় পিতা-মাতাই হয় উত্তরাধিকারী তাহলে মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের এক ভাগ। মৃতের ভাই বোন থাকলে মা সেই ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে। এসব বণ্টন মৃতের কোনো অসীয়ত থাকলে তা এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরে।

তোমাদের পিতা-মাতা এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততী, তোমাদের জানা নাই এদের মধ্যে তোমাদের কল্যাণের দিক দিয়ে কারা ঘনিষ্টতর। এই বণ্টন ব্যবস্থা ফরয করে দেয়া হয়েছে (তোমাদের জন্য) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং মহামহীম জ্ঞানের আধার।

আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তারা নিঃসন্তান হয়। সন্তান থাকলে তোমরা পাবে ত্যাক্ত সম্পত্তির চারভাগের এক ভাগ— তাদের করে যাওয়া অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা সব আদায়ের পরে। আর (তোমরা মরে গেলে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের তারা পাবে চার ভাগের একভাগ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। তা-ও কার্যকর হবে তোমাদের কোনো অসীয়ত এবং দেনা থাকলে তা আদায়ের পর।

আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক (সম্পদ রেখে মারা যায়) যার না আছে কোনো সন্তান আর না আছে পিতা-মাতা। আছে এক ভাই অথবা এক বোন তাহলে তাদের প্রত্যেকে (কোনো পার্থক্য ছাড়া) পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই বোন যদি দুই এর বেশি হয় তাহলে তারা সবাই মিলে

মোট সম্পদের তিন ভাগের একভাগ পাবে। তা-ও কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা আদায়ের পরে। কোনো ভাবেই কারো কোনো ক্ষতি করা বা হতে দেয়া যাবে না। (এসব কিছু) আল্লাহ্‌র দেয়া উপদেশ মালা। আর আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ অবহিত এবং পরম ধৈর্য্যশীল। (সূরা নিসা ঃ ১১-১২)

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ع

তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন— নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে। যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যার কোনো সন্তান নেই, আছে এক বোন। তাহলে সে (বোন) পাবে সম্পদের অর্ধেক আর যদি (এরকম কোনো) বোন মারা যায় তাহলে ভাই পুরো সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তাহলে ত্যাক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ তারা পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তাহলে পুরুষের অংশ নারীর অংশের দু'জনার সমান।

আল্লাহ (এই সব জটিল বিষয়গুলো খুলে খুলে) স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য যেন তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। (সূরা নিসা ঃ ১৭৬)

গ. প্রতিপক্ষ পুরুষের তুলনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী সমান অথবা বেশির অধিকারী হয়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী অধিকারী হয় প্রতিপক্ষ পুরুষের অর্ধেক। যাই হোক এটা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। মৃত ব্যক্তি এমন, যার পিতা-মাতাও নেই, পুত্র কন্যাও নেই। আছে বৈপিত্রীয় ভাই ও বোন। এদের প্রত্যেকে এক ষষ্টমাংশ করে পাবে।

মৃতের পুত্র কন্যা থাকলে মাতা-পিতা উভয়ে এক ষষ্টমাংশ করে পাবে। ক্ষেত্র বিশেষে নারী উত্তরাধিকার হয় পুরুষের দ্বিগুন। মৃত যদি একজন নারী হয় যার না

কোনো সন্তান আছে না আছে ভাই বোন, আছে স্বামী এবং মা ও বাবা। এখানে মৃত্যের স্বামী পাবে অর্ধেক সম্পদ এবং মা পাবে এক তৃতীয়াংশ বাবা পাবে এক ষষ্টমাংশ। বিশেষ এই ক্ষেত্রটিতে বাবার তুলনায় মা দ্বিগুন পাচ্ছে।

ঘ. নারী সাধারণত পুরুষের অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হয়

১. পুত্র যতটুকুর উত্তরাধিকারী হয় কন্যা তার অর্ধেক।

২. মৃতের কোনো সন্তান না-থাকলে স্বামী চারের এক অংশ এবং স্ত্রী আটের এক অংশ।

৩. মৃতের সন্তান থাকলে স্বামী দুইয়ের এক অংশ স্ত্রী চারের এক অংশ।

৪. যদি মৃতের পিতা-মাতা অথবা সন্তান না থাকে তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ঙ. পুরুষ নারীর চাইতে দ্বিগুন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, কারণ সে পারিবারের আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা।

ইসলামে নারীর ওপরে কোনো আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব নেই যা পুরুষের কাঁধে ন্যাস্ত আছে। যে কোনো মেয়ের বিয়ের আগে পর্যন্ত থাকা, খাওয়া, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা তার বাবা অথবা ভাই। বিবাহের পরে এসব দায়িত্ব স্বামীর অথবা পুত্রের। ইসলাম পুরুষের ওপরই তার পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্যই তাকে উত্তরাধিকারে দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ এক পুত্র ও এক কন্যা এবং নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে এক লোক মারা গেল। এখন উত্তরাধিকার বণ্টনে পুত্র মালিক হলো পূর্ণ এক লক্ষ টাকার আর কন্যা পেলো মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায় এখন পুত্রের ঘাড়ে। সে সব প্রয়োজন পূরণে পুত্রকে প্রায় সব টাকাই ব্যায় করে ফেলতে হচ্ছে। অথবা ধরা যাক প্রায় আশি হাজার টাকা ব্যায় করে এখন তার কাছে আছে মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে কন্যা যে পেয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তা থেকে কারো জন্য একটি পয়সা খরচ করার কোনো দায়-দায়িত্ব তার ওপরে নেই এবং সে বাধ্যও নয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ টাকাটাই তার কাছে গচ্ছিত আছে।

এখন আশি-নব্বুই এমন কি পুরোটাই প্রয়োজনে ব্যয় করতে হতে পারে এমন ঝুকির মুখে, এক লক্ষ টাকা আর একটি পয়সারও কোনো দায়-দায়িত্ব নেই এমনভাবে সংরক্ষিত পঞ্চাশ হাজার টাকা— কে কোনটা নিতে চাইবেন ?

১৫. কুরআন কি আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ্‌র কথা ?

প্রশ্ন ঃ কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন আক্ষরিক অর্থেই কুরআন আল্লাহর কথা ?

জবাব

ইন্টারনেটে পাওয়া যায়নি বলে এখানে দেয়া সম্ভব হলো না। তবে আই, আর, এফ কতৃপক্ষ এর কলের সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে যে, কমপক্ষে পাঁচ পৃষ্ঠা হবে এই একটি প্রশ্নের জবাব। আমরাও ইনশাআল্লাহ আগামী সংস্করণে তা সংযোযন করতে পারবো বলে আশা রাখি।

১৬. পরকাল— মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন ঃ কিভাবে প্রমাণ করবেন, পরকালের অস্তিত্ব অর্থাৎ 'মরনের পরে আবার একটি স্থায়ী জীবন আছে' ?

জবাব

ক. 'পরকালে আস্থা' অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়

অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যান, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত প্রকৃতির কোনো মানুষ কিভাবে পরকাল বা মৃত্যুর পরে আর একটি জীবনের ওপরে আস্থা রাখতে পারে? তারা ধারণা করে যে, যারা পরকালে আস্থাশীল তাদের যে আস্থা, তা একটি অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পরকালে আমার আস্থা সঙ্গত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খ. 'পরকাল' একটি যৌক্তিক বিশ্বাস

বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি নিয়ে জ্যোতীর্ময় কুরআন অন্তত হাজারের ওপরে আয়াত ধারণ করে আছে (এ প্রসঙ্গে আমার বই কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সুসঙ্গত

অথবা অসঙ্গত) বিগত কয়েক শতাব্দীতে কুরআন বর্ণিত বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও সে পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়নি যাতে কুরআন বর্ণিত প্রতিটি বিষয়কে সত্যায়ীত করতে পারে।

যদি কুরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহের ৮০% ইতিমধ্যে শতকরা একশ ভাগ সত্যতা নিয়ে প্রমাণিত হয়ে থাকে। বাকি থাকলো মাত্র ২০% ভাগ, যে সব সম্পর্কে বিজ্ঞানের কাছে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। যেখানে বিজ্ঞানই এখন পর্যন্ত সে পর্যায়ে পৌছায়নি যাতে কুরআনের এসব বর্ণনাকে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে। কাজেই আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত করে ঐ ২০% ভাগ অনুদ্‌ঘাটিত সত্যাসত্যের এমন কি একটি আয়াতও ভুল— একথা বলতে পারিনা।

তাই কুরআনের ৮০% ভাগ যেখানে চূড়ান্তভাবে সত্য বলে প্রমাণিত এবং বাকি ২০% ভাগ শুধু প্রমাণের অপেক্ষায়। সেখানে যৌক্তিতা এটাই বলবে যে, ঐ ২০% ভাগও সময়ে সত্য বলেই প্রমাণিত হবে। কুরআনে বর্ণিত পরকালীন স্থায়ী জীবনের বিষয়টি ঐ ২০% ভাগের অন্তর্ভূক্ত, অনুদ্‌ঘাটিত একটি সত্য। যৌক্তিকতা এখানে তার সত্যতার দিকেই মত দেবে।

গ. 'পরকাল দর্শন' ছাড়া শাস্তি ও মানবীক মূল্যবোধসমূহ সম্পূর্ণ অর্থহীন

ডাকাতি করা ভালো না মন্দ কাজ ? ভারসাম্যপূর্ণ সাধারণ একজন মানুষও বলবেন, এটা জঘন্য কাজ। পরকালের ভালো-মন্দ যে বিশ্বাস করে না সে কেমন করে একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অপরাধীকে বোঝাবে যে, ডাকাতি একটি জঘন্য অপরাধ ?

ধরা যাক, পৃথিবীতে আমি একজন শক্তিশালী অপরাধী, একই সাথে আমি একজন বুদ্ধিমান ও যুক্তি পরায়ন মানুষ। আমি বলব ডাকাতি একটি ভালো কাজ কেননা এটা আমাকে বিলাস বহুল জীবন যাপন করার সহায়তা করছে— তাই ডাকাতি আমার জন্য ভালো।

যদি কেউ আমার সামনে উপযুক্ত একটি যুক্তিও দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারে যে, ডাকাতি আমার জন্য মন্দ কেন ? তাহলে সাথে সাথে একাজ আমি ছেড়ে দেব।

মানুষ সাধারণত যে সব যুক্তি সামনে রাখে।

১. কেউ হয়তো বলবে যার সর্বস্ব ডাকাতি হয়ে গেছে সে সমস্যায় পড়বে

আমি অবশ্যই তার সাথে একমত যে, যার ওপর ডাকাতি চালানো হয়েছে তার জন্য এটা মন্দ। কিন্তু এটা আমার জন্য তো ভালো। আমি যদি হাজার ডলার ডাকাতি করে থাকি তাহলে অত্যন্ত অনন্দের সাথে কোনো পাঁচতারা হোটেলে দু'চার বেলা খাবার খেতে পারব।

২. তোমার ওপরেও কেউ ডাকাতি চালাতে পারে

কেউ হয়তো বলবেন একদিন আমার সর্বস্বও ডাকাতি হয়ে যেতে পারে। আমার কাছে থেকে কেউ কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। কারণ আমি নিজেই অনেক শক্তিশালী। অন্তত শ'খানেক বডিগার্ড আছ আমার। ডাকাতি আমি করি, আমার ঘরে কে ডাকাতি করবে?

একজন সাধারণ মানুষের জন্য ডাকাতি একটা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে কিন্তু আমার মতো প্রভাবশালী মানুষের জন্য নয়।

৩. পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে

কেউ হয়তো বলবেন পুলিশ তোমাকে একদিন ধরে ফেলবে। পুলিশ আমাকে ধরবে না। কারণ পুলিশকে আমি রীতিমতো টাকা দেই। এমনকি শক্তিশালী এক মন্ত্রীকেও আমি বড় বড় চাঁদা দেই। হাঁ এ ব্যাপারে আমি একমত যে, একজন সাধারণ মানুষ ডাকাতি করলে সে ধরা পড়ে যেতে পারে এবং তার জন্য সে অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে। কিন্তু আমার তো এধরনের কোনো ভয়ই নেই। ধরা পড়লেও সাথে সাথে আমি মুক্ত হয়ে যাবো এ গ্যারান্টি আমার আছে।

যুক্তিপূর্ণ একটা কারণ কেউ আমাকে দেখাক— কেন এটা আমার জন্য মন্দ এবং কেনই বা এ পেশা আমি ছেড়ে দেব।

৪. কেউ হয়তো বলবেন এটা ফাঁকা পয়সা, কষ্টার্জিত নয়

আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত— এটা খুব সহজে উপার্জিত টাকা। মূলত এটাই তো আসল কারণ, যে জন্য আমি ডাকাতি করি। যদি কোনো মানুষের সামনে উপার্জনের দু'টো পথ খোলা থাকে— একটা সহজ আর একটা কঠিন— বুদ্ধিমান যে কোনো মানুষ সহজ পথটাকেই তো বেছে নেবে!

৫. এটা মানবতা বিরোধী

কেউ হয়তো বলবেন এটা মানবতা বিরোধী। মানুষের জন্য মানুষের ভাবা উচিত। আমি তাদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন করব। মানবতার এ বিধান কে লিখেছে? কেন আমি তা মানতে যাব? এ আইন হতে পারে আবেগ প্রবন অনুভূতিশীল মানুষের জন্য ভালো। কিন্তু আমি সঙ্গত যুক্তি ছাড়া কিছুই মানতে রাজি না— মানুষের ভাবনা আমি ভাবতে যাবো কোন দুঃখে?

৬. এটা চরম স্বার্থপরতা

কেউ হয়তো বলবেন ডাকাতি একটি চরম স্বার্থপরতা। হাঁ একথা মানি, ডাকাতি একটা স্বার্থপর কাজ। তাহলে আমি কি আমার স্বার্থ দেখব না? এটাতো আমাকে আমার জীবন ভোগের উপায় করে দিয়েছে!

১. যুক্তি দিয়ে ডাকাতিকে মন্দ প্রমাণ করা যাবে না

অতঃপর ডাকাতিকে মন্দ কাজ হিসেবে প্রমাণ করার সকল যুক্তি উপস্থাপন ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণিত হলো। এসব যুক্তির কথা একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে কিন্তু আমার মতো একজন সবল প্রভাবশালী অপরাধীকে নয়। কোনো বিতর্কই শুধুমাত্র যুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা। কাজেই পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য অপরাধীর জয়জয়কারে অবাক হবারও কিছু নেই।

একই ভাবে প্রতারণা, নারীধর্ষণ ইত্যাদি আমার মতো ব্যক্তির জন্য ভালো হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং যৌক্তিকতার দিক দিয়ে এমন কোনো কারণ নেই যা আমাকে বোঝাতে পারে যে, এসব কাজ মন্দ।

২. একজন শক্তিধর প্রভাবশালী অপরাধীকেও একজন মুসলিম বুঝিয়ে নমনীয় করতে পারে

এবার একটু অন্যভাবে দেখা যাক। ধরুন আপনি এ পৃথিবীর একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। পুলিশ আপনার বগল তলে। এমনকি দু' চারজন মন্ত্রী-মিনিস্টারও হাতের মুঠোয়। বহু চেলা-চামুণ্ডা রয়েছে আপনাকে পাহারা দেবার জন্য। আর আমি একজন মুসলিম যে আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হবো— ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি জঘন্য কাজ।

এখন আমি যদি একই যুক্তিতর্ক তার সামনে রাখি একইভাবে সে উত্তর দেবে যেমনটা আগে সে দিয়েছে।

একথাও সত্যি যে, অপরাধী অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং তার সকল যুক্তি সঠিক। কিন্তু তা কেবল তখনি সত্য ও সঠিক যখন সে একজন শক্তি ও প্রভাবশালী অপরাধী।

৩. প্রতিটি মানুষ ন্যায় ও সুবিচারের আকাঙ্ক্ষি

এমনকি এ সুবিচার যদি সে অপরের জন্য না চায়— নিজের জন্য তা অবশ্যই আশা করে। শক্তি ও প্রভাবের কারণে অনেকে নেশা করে আর অন্যদের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। এই একই মানুষ ফোঁস করে উঠবে যদি তাদের প্রতি কোনো অবিচার হয়। এধরনের মানুষের অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি কোনো অনুভূতি না থাকার কারণে তারা ক্ষমতা ও প্রভাবের পূজা করে। এই ক্ষমতা ও প্রভাবের জন্য তারা যে শুধু অন্যের ওপরে অবিচার করতে পারছে তা-ই নয় বরং অন্যে যাতে তাদের প্রতি এই একই আচারণ না করতে পারে তার প্রতিরোধও করছে।

৪. আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং ন্যায়পরায়ণ

একজন মুসলমান হিসেবে আমি অপরাধিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্মত করাব যে, এই আল্লাহ তোমার চাইতে অনেক অনেক বেশি শক্তির অধিকারী এবং একই সাথে তিনি ন্যায়পরায়ণও। জ্যোতির্ময় কুরআন বলছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিচার করেন না (কারো প্রতি) বিন্দু পরিমাণ

৫. আল্লাহ আমাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন না ?

অপরাধী, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞান মনস্ক হবার করণে কুরআনের বিজ্ঞান ও উত্তমতম ও যুক্তিসঙ্গত দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের পরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি থাকল না। এখন সে হয়তো প্রশ্ন করে বসবে যে, আল্লাহ শক্তিমান এবং সুবিচারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন না।

৬. যারা অবিচার করে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার

প্রতিটি মানুষ, যে কোনো অবিচারের শিকার হয়েছে— তা আর্থিক দিক থেকেই হোক অথবা সামাজিক দিক থেকে— ভূক্তভোগী প্রতিটি মানুষ চাইবে

জালিমের শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা, ডাকাত-ধর্ষককে উচিত শিক্ষা দেয়া হোক। যদিও অসংখ্য অপরাধি ধরাও পড়ছে, শাস্তিও পাচ্ছে কিন্তু তার চাইতে আরো অনেক বেশি পরিমাণ মুক্ত থেকে সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নিজের স্ফূর্তিময় বিসালপূর্ণ জীবন যাপন করছে। যদি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির ওপর অবিচার আপতিত হয় এমন একজনের দ্বারা যে তার চাইতেও বেশি শক্তিধর। তখন এই অপরাধিও চাইবে যে, তার প্রতি অবিচারকারীর চরম শাস্তি হোক।

৭. এই জীবন পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য পরীক্ষার অবকাশ মাত্র

পরকালের অনন্ত জীবনে কৃতকার্যতার সাথে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য জীবনটা একটা পরীক্ষা। জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন— মৃত্যু ও জীবন, যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন— কাজে-কর্মে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম। তিনি তো মহাশক্তিমান ক্ষমা দানকারী। (সূরা আল-মুলক ঃ ২)

৮. চূড়ান্ত ফয়সালা শেষ বিচার দিনে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যু-যাতনা ভোগ করতে হবে এবং অবশ্যই পুরোপুরি ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হবে তাদের পাওনা কেয়ামতের দিন। তখন যে রক্ষা পেলো আগুন থেকে এবং প্রবেশ করতে দেয়া হলো জান্নাতে নিশ্চিতভাবে সে-ই লাভ করলো চূড়ান্ত সফলতা। আর কিছুই নয় এই পৃথিবীর জীবন, শুধু (ক্ষণিকের) মায়া ও মোহময় আয়োজন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫)

ভালো মন্দের সবকিছু পরিমাপ করে দেখানো হবে শেষ বিচার দিনে। একজন মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে সর্বকালের সকল মানুষের সাথে শেষ বিচার দিনে। এটা খুবই সম্ভব যে, একজন মানুষ তার প্রাপ্য শাস্তির কিছু অংশ এই পৃথিবীতে পেলো। আর চূড়ান্ত শাস্তি অথবা পুরস্কার সে পাবে

পরকালে। বিধাতা প্রতিপালক একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষককে পৃথিবীতেই কোনো শাস্তি নাও দিতে পারেন, কিন্তু শেষ বিচার দিনে তাকে অবশ্যই সব কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং সেই স্থায়ী পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যে জীবন সেই জীবনে।

৯. মানুষের আইন হিটলারকে কি শাস্তি দিতে পারে ?

'হিটলার' তার ভয়ঙ্কর ত্রাসের শাসনামলে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে পুড়িয়ে মেরেছে। এখন পুলিশ যদি তাকে গ্রেফতার করতো তাহলে মানুষের আইন ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাকে কি শাস্তি দিত ? সর্বোচ্চ শাস্তি তারা তাকে যা দিতে পারত তাহলো সেই গ্যাস চেম্বারে খোদ হিটলারকে ঢুকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তাতে তো শুধুমাত্র একজন ইহুদী হত্যার প্রতিশোধ হতো! বাকি যে ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯শ ৯৯ জন ইহুদী— তাদের হত্যার প্রতিশোধ কিভাবে হবে ?

১০. শুধুমাত্র আল্লাহ পারেন হিটলারকে জাহান্নামে ফেলে ষাট লক্ষ বারের চাইতেও বেশি বার জ্বালাতে

জ্যোতির্ময় কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

"যারা আমাদের আয়াত সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে খুব শিঘ্রই আমরা তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়া যখন পুড়ে গলে যাবে তখন তার বদলে আমরা তাদেরকে নতুন চামড়া দিয়ে দেব। যেন তারা আযাবের স্বাদ বুঝতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা শক্তিমান মহাজ্ঞানি। (৪ঃ ৫৬)

পরকালের অনন্ত জীবনে হিটলারকে একমাত্র আল্লাহই পারেন ষাট লক্ষ বার পুড়ে মরার স্বাদ কেমন তা বুঝিয়ে দিতে।

১১. মানবীয় মূল্যবোধ অথবা ভালো ও মন্দের ধারণা— পরকালের নিশ্চিত আস্থা ছাড়া আদৌ কোনো মূল্য রাখে না।

যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা সত্য এই যে, পরকালে যার দৃঢ় আস্থা নেই, মানবীয় মূল্যবোধ এবং ভালো ও মন্দ কাজের পরিণতি এমন ব্যক্তির কাছে প্রমাণ

করা সম্পূর্ণ অসম্ভব— এখানে যে অবিচার, জুলুম, অত্যাচার করেই যাচ্ছে। বিশেষ করে যদি সে ক্ষমতাবান হয়।

১৭. মুসলমানরা এত ভাগে বিভক্ত কেন ? চিন্তধারার বিভিন্নতার কারণে কি ?

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা যেখানে এক এবং একই কুরআনের অনুসারী। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত বিভক্তি এবং চিন্তাধারার এত বিভিন্নতা কেন ?

জবাব

ক. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত

এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আজকের মুসলমান নিজেদের মধ্যেই অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। আর তার চাইতেও দুঃখজনক হলো এই বিভক্তি খোদ ইসলামের দ্বারা আদৌ স্বীকৃত নয়। ইসলাম বিশ্বাস করে তার অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য এবং একতার লালন করতে।

জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

এবং আঁকড়ে ধরো দৃঢ়তার সাথে সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (যা তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন তোমাদের জন্য কুরআনের আকারে) এবং নিজেরা বিভক্ত হয়ে যেও না। (৩ ঃ ১০৩)

এ আয়াতে যে রজ্জুর কথা বলা হয়েছে সে রজ্জু কি বা কোন রজ্জু ? জ্যোতীর্ময় কুরআন, মহাবিজ্ঞান আল-কুরআনই সেই আল্লাহ্‌র রজ্জু যা সকল মুসলমানের সম্মিলিতভাবে ধরে রাখা উচিত। ঐক্যের ব্যাপারে দ্বিগুন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সবাই মিলে শক্ত করে ধরো বলার সাথে সাথেই বলা হয়েছে বিভক্ত হয়ো না।

কুরআন আরো বলছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (৪ঃ ৫৯)

সকল মুসলমানের কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ অনুসরণ করা কর্তব্য এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত নয়।

খ. ফের্কাবাজী ও বিভক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ

জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে তোমার এতটুকু সম্পর্ক নেই। তাদের এসব ব্যাপার আল্লাহ্ কাছে ন্যস্ত। অবশেষে তাদেরকে তিনি বলে দেবেন সেই সব সম্পর্কে যেসব কাজ তারা করছিল। (সূরা আনআম ঃ ১৫৯)

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তাদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু কেউ যখন কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে— তুমি কে ? সাধারণ উত্তর হলো, আমি একজন সুন্নী অথবা আমি শিয়া। অনেকেই নিজেদেরকে হানাফী অথবা শা'ফী অথবা মালেকী অথবা হাম্বলী ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত হতে গর্ববোধ করেন। কেউ আবার দেওবন্দী। কেউ ব্রেলোভী।

গ. আমাদের রাসূল (স) ছিলেন শুধু একজন 'মুসলিম'

এ ধরনের একজন মুসলমানকে কেউ যদি প্রশ্ন করে আমাদের প্রিয় নবী (স) কি ছিলেন ? তিনি কি একজন হানাফী অথবা শাফী অথবা হাম্বলী ছিলেন ? না! তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। তাঁর পূর্বে আগত আল্লাহ্র সকল নবী ও রাসূলগণের মতো।

যেমন সূরা নিসা ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে— ঈসা (আ) ছিলেন একজন মুসলিম। ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে— ইব্রাহীম না ইহুদী ছিল না খ্রীস্টান, সে ছিল একজন মুসলমান।

ঘ. কুরআন বলছে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দাও

কেউ পরিচয় জানতে চাইলে তার বলা উচিত আমি একজন মুসলিম— না হানাফী না শাফী।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আর কে হতে পারে বক্তব্যে তার চাইতে উত্তম ? যে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে আহ্‌বান করে আর যাবতীয় জীবন-কর্ম যেভাবে আল্লাহ্‌ করতে বলেছেন সেভাবে করে এবং বলে, আমি তো আল্লাহতে সমর্পিতদের একজন (মুসলিম)। (৪১ ঃ ৩৩)

কুরআন বলে— "আমি তাদেরই একজন যারা আল্লাহতে সমর্পিত। অন্য কথায়— বলো, আমি একজন মুসলিম।

২. রাসূলুল্লাহ (স) অমুসলিম রাজা বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই সব চিঠিতে তিনি সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াত উল্লেখ করেছিলেন।

فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

তাহলে বলে দিন ওদেরকে তোমরা সাক্ষী থাকো একথার যে আমরা (কিন্তু) সর্বান্তকরণে আল্লাহতে আত্মসর্ম্পনকারী 'মুসলিম'। (৩ ঃ ৬৪)

ঙ. ইসলামের মহান ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান

ইসলামের ইতিহাসে মহান ইমাম ও আলেমগণের প্রতি আমাদের সম্মানবোধ আন্তরিক হতে হবে। তাঁদের জীবন-নিংড়ানো জ্ঞান সাধনা মুসলিম জাতিকে জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁরা পুরুস্কৃত হবেন। সাধারণের মধ্যে কেউ যদি বিশেষ কোনো ইমামের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সেটা অবশ্যই দোষের কিছু নয়। কিন্তু পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের কারো নাম জড়িয়ে পরিচয় দেয়া এক ধরনের সংকীর্ণতার প্রকাশ। যেমনটা করতে তাঁরা কেউ বলে জাননি। নবী রাসূলগণের মতো তাঁরাও ছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহতে সমর্পিত 'মুসলিম'। কাজেই তাঁদের কারো অনুসারী হলেই পরিচয় বদলে যায় না। মুসলমানদের পরিচয় একটাই— তারা মুসলিম।

অনেকেই হয়তো তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংকীর্ণ মানসিকতাকে চাপা দেবার জন্য সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত ৪৫৭৯ নং হাদীস খানি নিয়ে তর্কে লাফিয়ে

পড়বেন। যা রাসূল (স) বলেছেন, "আমার উম্মত ৭৩টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।"

কিন্তু এ হাদীসখানি রাসূল (স) তাঁর উম্মতের অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেসব বিকৃতি দেখা দেবে তারই অন্যতম একটি আগাম বার্তা বহন করছে। তিনি তো একথা বলেননি। যে মুসলমানরা এভাবে ফের্কায় ফের্কায় ভাগ হয়ে যেতে হবে।

কুরআন যেখানে আমাদেরকে আদেশ করছে কোনো বিভক্তির সৃষ্টি করা যাবে না। অতএব যারা কুরআন ও শুদ্ধ হাদীস সমূহের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং কোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতার না কারণ হয় না কাউকে উৎসাহিত করে তারাই সঠিক পথে রয়েছেন।

তিরমীযির ১৭১ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (স) বলেছেনঃ আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্যে শুধু একটি ছাড়া বাদ বাকি সব জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই শুদ্ধ দল কোনটি হবে ? রাসূল (স) বললেন, "যাদের কাছে আমি এবং আমার সঙ্গী সাথীরা অনুস্মরণীয় হবো"।

"আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের" কুরআনের বহু জায়গায় এই একটি কথা মুসলমানদের মনের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসিয়ে দেবার জন্য নানান ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কাজেই একজন মুসলমানের অনুস্মরণীয় আদর্শ হচ্ছে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস। তারপর এ দুয়ের নির্দেশনা সমূহকে অনুশীলনীর পদ্ধতি হিসেবে সে যদি কোনো বিশেষ আলেমকে অনুসরণ করতে চায় তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তা যদি আবার কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে খোদ কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে তা যত বড় বিশেষজ্ঞ আলেমই হোকনা কেন— দুই কড়ি মূল্য রাখেন না।

প্রতিটি মুসলমান যদি তার সামর্থ অনুযায়ী কুরআন বুঝে পড়ার অনুশীলনী করে এবং সেখান থেকে পাওয়া মূলনীতিসমূহ খোদ রাসূল (স)-এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাহলে ইনশাআল্লাহ একদিন এই বিভক্তি দূর হয়ে যাবে এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এক 'উম্মাহ' হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সমক্ষ হবে।

১৮. সকল ধর্মই তো ভালো ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তাহলে শুধু ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে কেন ?

প্রশ্ন ঃ সকল ধর্মই মূলত তার অনুসারীদেরকে ভালো ভালো কাজ করতে শিক্ষা দেয়। তা হলে শুধু ইসলামকে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে কেন ? যে কোনো একটি ধর্ম অনুসরণ করলে সমস্যা কোথায় ?

জবাব

ক. অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য

মূলত প্রতিটি ধর্মই মানুষকে মন্দ দূর করে ভালো হবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ইসলামের পরিধি আরো ব্যাপক। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায়-পরায়ণতা অর্জনের প্রকৃতিসম্মত পথ ও পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়। এবং দেখিয়ে দেয় কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে যাবতীয় মন্দ নির্মূল করা যায়। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও সমাজের চিন্তা ভাবনা ও রুচি অভিরুচিকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম খোদ সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার দেয়া মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতীর দিক নির্দেশিকা। এ কারণে ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিৎরাহ' বা মানুষের প্রকৃতি সম্মত জীবন ব্যবস্থাও বলা হয়।

খ. যেমন ইসলামে আমাদেরকে চুরি, ডাকাতি পরিহার করতে বলার সাথে সাথে সে এ-ও বলে দেয় যে, কেমন করে সমাজ থেকে এ প্রবণতা নির্মূল করা যাবে।

১. বড় বড় সব ধর্মই শিক্ষা দেয় চুরি-ডাকাতি মন্দ কাজ। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের পার্থক্য কোথায় ? পার্থক্যটা হলো চুরি ডাকাতি মন্দ কাজ এ শিক্ষার সাথে সাথে ইসলাম এমন একটি সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের বাস্তব পদ্ধতি নির্দেশ করে— যে সমাজে চুরি ডাকাতির প্রয়োজনই পড়বে না।

২. মানুষের অভাব দূর করতে ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়েছে।

ইসলাম বিধান দিয়েছে, এমন ব্যক্তির জন্য যাকাত বাধ্যতামূলক যার নিসাব পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় ব্যায়ের পরে ৮৫ গ্রাম সোনা বা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা অন্যান্য মালপত্র উদ্বৃত্ত থাকবে। ২.৫% বা শতকরা

আড়াই টাকা প্রতি চন্দ্র বৎসরের শেষে তাকে (অভাবগ্রস্থদের দিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি সম্পদশালী ব্যক্তি যদি সত্যি সত্যিই এই যাকাত আদায় করে তাহলে দারিদ্রতা বলতে পৃথিবীতে কিছু থাকবে না। তখন ভিক্ষা দিতেও একজন ভিখারী খুঁজে পাওয়া যাবে না (এই হলো ইসলামী অর্থনীতির মাত্র একটি কার্যক্রম। শুধুমাত্র এই যাকাত ব্যাবস্থাটুকু কার্যকর হলে হাত পাতার লোক খুঁজে পেতে হবে)।

৩. চুরি ডাকাতির শাস্তি হাত কেটে ফেলা

চোর ডাকাত, প্রমাণিত হলে তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে ইসলাম। জ্যোতীর্ময় কুরআন বলছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

চোর অথবা চোরণী, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও। এটাই শাস্তি যে কর্ম তারা করেছে তার দৃষ্টান্তমূলকভাবে (দেয়া) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। আর আল্লাহ মহা শক্তিমান জ্ঞানপূর্ণ। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৩৮)

অনেক অমুসলিম বলে ফেলবেন, এই বিংশ শতাব্দীতে কারো হাত কেটে ফেলা ? এ-তো মধ্য যুগীয় বর্বরদের কাজ। ইসলাম তো তাহলে এক নিষ্ঠুর ধর্ম।

৪. ইসলামী বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তার কল্যাণী ফলাফল হাতে হাতে পাওয়া যায়

আমেরিকা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে উন্নততম। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও তার আছে সর্বোচ্চ রেকর্ড। এহেন আমেরিকায় যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়— একদিকে প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তি রীতিমতো যাকাত আদায় করছে অপর দিকে নারী বা পুরুষ চোর প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হাত কেটে ফেলা। তাহলে আমেরিকায় চুরি, ডাকাতির বর্তমান প্রবণতা বাড়বে, না একই রকম থাকবে, নাকি একেবারে কমে যাবে ? সঙ্গত ভাবেই তা কমে যাবে। তদুপরি এই ধরনের কঠিন আইন থাকলে অনেক স্বভাবের চোরও নিজেকে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ চুরি ডাকাতি প্রায় বিলুপ্ত।

একথা মানতেই হবে যে, পৃথিবীব্যাপী চুরি-ডাকাতির বর্তমান যে হার তাতে হাত কাটা আইন চালু হলে লক্ষ লক্ষ লোক এমন দেখা যাবে যাদের হাত কাটা। বিষয়টা হলো— যে মুহূর্তে এই আইন ঘোষণা করা হবে তার পরের মুহূর্ত থেকেই এ প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমে আসতে থাকবে। পেশাদারী চোরও এ পথে পা ফেলার আগে একবার ভেবে নেবে— ধরা পড়লে তার পরিণতি কি হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই চোরের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। তখন নিতান্ত দুরাত্মা ও দুর্ভাগা ছাড়া এ কাজ আর কেউ করবে না। সামান্য কয়েকটি লোকের হয়তো হাত কাটা যাবে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ লাভ করবে নিরাপত্তা, শান্তি এবং সর্বস্ব হারাবার ভয় থেকে মুক্তি।

ইসলামী বিধান এই রকম বাস্তবধর্মী এবং প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক

গ. যেমনঃ ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে নারী ধর্ষণ ও উৎপীড়ন। সাথে সাথে কার্যকর করতে বলেছে নারী ও পুরুষের পারস্পরীক সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় উভয়ের জন্য কঠোরভাবে পালনীয় হিজাব বা পর্দা এবং সাব্যস্ত ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১. ধর্ষণ ও উৎপীড়নের শেকড় শুদ্ধ নির্মূল করার পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম

বড় বড় সকল ধর্ম নারী ধর্ষণ ও উৎপীড়ন জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে কি পার্থক্য ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ? পার্থক্যের বিষয়টা হলো ইসলাম শুধুমাত্র নারী মর্যাদার ওয়াজই করেনা বা ধর্ষণ ও উৎপীড়নকে ঘৃণার সাথে জঘণ্য অপরাধ হিসেবে পরিত্যাগ করতেই বলে না। সাথে সাথে সুস্পষ্ট নির্দেশনাও দেয় কিভাবে সমাজ থেকে এই অপরাধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২. পুরুষের পর্দা

হিজাব বা পর্দা ইসলামের একটি বিধান। জ্যোতীর্ময় কুরআন প্রথম উল্লেখ করেছে পুরুষের পর্দা। তারপরে তা নারীর জন্য।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

(হে রাসূল!) মো'মেন পুরুষদের বলো ঃ তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে। এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহ হেফাজত করে। এটা তাদের আরো পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। (তাদের চরিত্র নির্মাণের জন্য) যা কিছুই তারা করে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ সে সব কিছু সম্পর্কেই খবর রাখবেন। (সূরা নূর ঃ ৩০)

যে মুহূর্তে একটি পুরুষ একজন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলো যদি কোনো ধরনের অশ্লীল চিন্তা মাথায় এসে যায় এই ভয়ে সাথে সাথে তার দৃষ্টি নামিয়ে নেবে।

৩. নারীর পর্দা

কুরআন নারীর পর্দা সম্পর্কে এভাবে বলেছে ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ

আর (হে নবী) মো'মেন স্ত্রীলোকদের বলুন! তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করে। আর যেন প্রদর্শনী না করে তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও অলংকারের। তবে এ সবের মধ্যে যা অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আর তারা যেন ঝুলিয়ে দেয় তাদের ওড়না তাদের বুকের ওপর। আর তারা প্রকাশ করবে না তাদের রূপ-সৌন্দর্য তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীদের পিতা (শ্বশুর) অথবা তাদের পুত্র। (সূরা নূর ঃ ৩১)

নারীর জন্য হিজাবের পরিধি তার সম্পূর্ণ দেহ আবৃত থাকতে হবে ঢিলেঢালা কাপড়ে। শুধু কব্জী পর্যন্ত হাত এবং মুখ মণ্ডল খোলা থাকতে পারে যদি তারা চায়, তা না হলে তাও ঢেকে নিতে পারে। অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞ মুখমণ্ডল ঢাকারও পরামর্শ দেন।

৪. হিজাব উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে

নারীকে কেন আল্লাহ হিজাব ধারণ করতে বলেছেন কুরআনে তা এভাবে বলা হয়েছে

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণ এবং ঈমান গ্রহণকারী নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন ঝুলিয়ে দেয় তাদের নিজেদের ওপর তাদের বড় চাদর জাতীয় কিছু (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাদের পরিচিতির জন্য ন্যুনতম (পোষাক) তাহলে তারা আর উৎপীড়িত হবে না। আর আল্লাহ তো আছেনই ক্ষমা দানকারী দয়াময় (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

কুরআন বলে, নারীকে এই কারণে হিজাব পড়তে বলা হয়েছে যেন তারা রুচিশীলা মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়। এটা তাদেরকে উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবে।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ রেকর্ড

আমেরিকায় ১৯৯০ সালে এফ, বি, আই, এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১,০২,৫৫৫ টি ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। মন্তব্যে বলা হয়েছে আনুমানিক সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ ঘটনার অভিযোগ করা হয়। তাহলে সত্যিকারের পরিমাণ বের করতে হলে ৬.২৫ দিয়ে গুন করতে হবে। দাঁড়ালো ৬,৪০,৯৬৮ এ সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রতিদিন ১৭৫৬টি ধর্ষনের ঘটনা আমেরিকায় ঘটছে।

আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জ্যাস্টিস এর ন্যাশানাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সারভে ব্যুরো অব জাস্টিস এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে ৩,০৭০০০ ধর্ষনের অভিযোগ রেকর্ড করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে সংঘটিত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১ শতাংশ অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাহলে ৩,০৭,০০০ x ৩,২২৬ =৯,৯০,৩২২টি ধষর্নের ঘটনা ১৯৯৬ সালে ঘটেছে। প্রতিদিন ২৭১৩ অর্থাৎ প্রতি ৩২ সেকেণ্ঠেথণ পৃথিবীর সভ্যতম দেশে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ এর এই পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। মনে হয় আমেরিকার ধর্ষকরা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এফ, বি, আই এর রিপোর্টে বলা হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশ ঘটনার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ সংঘটিত ঘটনার মাত্র ১.৬% ভাগ। এদিকে অভিযুক্তদের ৫০ শতাংশ বিচারের আগেই বেরিয়ে যায়। তার মানে ০.৮% ভাগ ধর্ষক বিচারের সম্মুখীন হয়। অন্য কথায় কোনো ধর্ষক ১২৫ জন নারীকে ধর্ষণ

করলে এর মধ্যে তার ধরা পড়ে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র একবার। অনেক ধর্ষণকামী পুরুষ এটাকে একটা নিশ্চিন্ত বাজী ও জুয়ার মতো ধরে নিতে পারে। কেননা ১২৫ বারে ধরা পড়ে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র একবার।

রিপোর্টে আরো বলা হয় ০.৮% শতাংশের যারা বিচারের সম্মুখীন হয় তাদের ৫০% শতাংশই এক বছরের কম, কারা ভোগ করে। যদিও আমেরিকার আইনে তার বিধান আছে ৭ বছরের। ধর্ষনের দায়ে প্রথমবার ধরা পড়লে বিচারকরা তাদের প্রতি কোমল দণ্ডের রায় দেন। ভেবে দেখার মতো বিষয় বটে! একজন ধর্ষক ১২৫ বার ধর্ষন করলে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা মাত্র একবার। আর ধরা পড়লে শাস্তির সম্ভাবনা মাত্র কয়েক মাস।

ঘ. মানবীয় সমস্যায় ইসলামের সমাধান বাস্তব মুখী

ইসলাম মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন পদ্ধতি। কেননা এর শিক্ষা অকার্যকর তত্ত্বগত বাগাড়ম্বর নয় বরং মানুষের যাবতীয় সমস্যার নগদ ও বাস্তব সমাধান। স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও সামাজিক সমস্যা, উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামে প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্জন করে। ইসলাম একারণেও শ্রেষ্ঠতম জীবন পদ্ধতি যে, এটা বাস্তব সম্মত বিশ্বজনীন ধর্ম। কোনো জাতি অথবা জাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

১৯. ইসলাম ও আজকের মুসলমানদের মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যদি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হয় তাহলে অসংখ্য মুসলমান কেন এত অসৎ অবিশ্বস্ত এবং নিকৃষ্ট অপরাধ জগতের সাথে এমনভাবে জড়িত।

জবাব

ক. প্রচার মাধ্যম

১. ইসলাম শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো সব পশ্চিমাদের হাতে— যারা ইসলামকে ভয় পায়। বিরামহীন ভাবে ওদের প্রচার যন্ত্রগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার করে যাচ্ছে এবং ছেপে যাচ্ছে। হয় তারা ভুল তথ্য দিচ্ছে অথবা ভুল তত্ত্ব দিচ্ছে অথবা ইসলামের আংশিক সত্যকে বিরাট করে তুলে ধরছে।

২. পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা ফাটলে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এর দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। এটাই হবে সংবাদের শিরোনাম। পরবর্তীতে যদি খুঁজে পাওয়া যায় যে, কোনো অমুসলিম এর জন্য দায়ি— তখন সে সংবাদটা আর উল্লেখ করার মতো কোনো খবর থাকবে না।

৩. পঞ্চাশ বছর বয়সী কোনো মুসলিম যদি ১৫ বছরের এক যুবতীকে তার সম্মতিক্রমেও বিবাহ করে তা চলে আসবে পত্রিকার প্রথম পাতায়। অথচ পঞ্চাশ বছরের কোনো অমুসলিম যদি ছয় বছরের কোনো মেয়েকে ধর্ষণও করে তাহলে সেটা হয় যাবে ভেতরের পাতার অনুল্লেখযোগ্য কোনো খবরের মতো। আমেরিকায় প্রতিদিন ২৭১৩ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, কিন্তু প্রচার মাধ্যমের জন্য এটা আদৌ কোনো খবর নয়। যে কোনো সময় যে কোনো নারী কোনো দুর্বৃত্তের দ্বারা ধর্ষিত হতে পারে— এটা বোধ হয় আমেরিকান নারীদের জন্য একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

খ. কালো ভেড়া সব পালেই আছে

এটা আমাদের ভালো করেই জানা আছে যে, কিছু মুসলিম অসৎ, চরিত্রহীন, প্রতারক ইত্যাদি। কিন্তু প্রচার মাধ্যম তা এমনভাবে প্রচার করে যে, এ ধরনের কাজ শুধু মুসলমানরাই করে। সমাজের কলঙ্ক সব সমাজেই আছে।

গ. সামগ্রীকভাবে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ

মুসলিম সমাজে এসব কলঙ্কিত লোকজন থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ সমাজের অধিকারী। সামগ্রীকভাবে আমরাই "নেশামুক্ত" বৃহত্তর সমাজ। যৌথভাবে আমরা এমন একটি সমাজ যারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি দান-দক্ষীণা করে থাকি। সামগ্রীকভাবে পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ নেই যেটা মুসলমানদের সাথে একটু তুলনা করে দেখাতে পারে, যেখানে মানবীয় মর্যাদাবোধ, সংযম, সহনশীলতা, মূল্যবোধ এবং নীতি-নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির প্রশ্ন ওঠে।

ঘ. একটি গাড়িকে তার ড্রাইভার দিয়ে বিচার করবেন না

'মার্সিডিস্' কোম্পানীর নতুন বেরিয়ে আসা লেটেস্ট মডেলের একটি গাড়ী যদি আপনি দেখে নিতে চান এবং চালকের আসনে এমন একজন লোককে বসিয়ে দিলেন যে ভালো ড্রাইভিং জানেনা। সে যদি ওটাকে নিয়ে দুম করে

কোথাও লাগিয়ে দেয় তাহলে আপনি কাকে দোষ দেবেন— গাড়িটিকে না ড্রাইভারকে ? ড্রাইভারকে !

গাড়িটি সম্পর্কে জানার জন্য আপনার উচিৎ ছিল ওটার ক্যাটালগ ও ম্যানুয়্যাল নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সামনে বসে খুঁটিয়ে খুটিয়ে সব জেনে নেয়া। চলার ধরন, গতী, জালানী খরচ, দুর্ঘটনা কবলিত হলে তা থেকে সুরক্ষার জন্য কি কি ব্যাবস্থা নেয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ীর আসল মূল্যমান যাচাই করা যায় না। টাকার জোরে অনেক কোটিপতির ছেলে বিশ্বসেরা কোম্পনীর গাড়ি কিনে দু'দিনেই তার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়।

একইভাবে জন্মগতভাবে পাওয়া 'ইসলাম' নিয়ে আজকের মুসলমানরা যা করছে তাতে তার বাহ্যিক অবয়ব দুমড়ে মুচড়ে এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে যা দেখে নতুন কোনো ক্রেতা দু'পা এগোলে দশ পা পিছিয়ে যান— একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে যিনি জীবনের পথটা সুন্দরভাবে পাড়ি দিয়ে সঠিক গন্তব্যে নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে চান তাকে তো সর্বোত্তম গাড়িটি খুঁজে বের করতেই হবে এবং গ্রহণ করতে হবে গাড়ি চেনার সঠিক পদ্ধতি, অর্থাৎ তার ম্যানুয়াল ও ক্যাটালগ ধরে বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

খোদ সৃষ্টিকর্তা বিধাতা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা রচিত মানব-জীবন ম্যানুয়্যাল, 'আল কুরআন' এবং তাঁরই নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম নমুনা-মানুষ মুহাম্মাদ (স) নির্মিত ক্যাটালগ বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ ইসলামকে চেনা ও জানার একমাত্র মাধ্যম।

ঙ. ইসলামকে বিচার করতে হবে তার বাস্তবায়নকারী মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম ঐতিহাসিকগণের পাশাপাশি কিছু অমুসলিম ঐতিহাসিক রয়েছেন যারা কোনো প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে নিতান্ত সততার সাথে মানবেতিহাসের সেবা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মাইকেল এইচ হার্ট তার রচিত 'দি হানড্রেড' গ্রন্থে মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ একশত ব্যক্তিত্বের একটি তালিকা তৈরী করেছেন। তাতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে এক নম্বর দিয়ে প্রথমেই যার নামটি লিখেছেন, তিনি মুহাম্মাদ (স)। থমাস কার্লাইল এবং লা-মর্টিন এর মতো ব্যক্তিত্বগণও তাদের রচনায় ইসলামের নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি প্রভুত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

২০. অমুসলিমদের কাফের বলা

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা কেন অমুসলিমদের কাফের বলে গালি দেয় ?

জবাব

কাফের মানে যে প্রত্যাখ্যান করে

কাফের শব্দটি মূল শব্দ 'কুফর' থেকে উৎপন্ন। যার মানে গোপন করা, আড়াল করা, অথবা প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামী পরিভাষায় কাফের বলা হয় সেই লোককে যে ইসলামের মহাসত্যকে গোপন করে, আড়াল করে বা প্রত্যাখ্যান করে এবং এমন এক ব্যক্তি, যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে বাংলায় অমুসলিম এবং ইংরেজীতে 'নন্‌মুসলিম' বলা হয়।

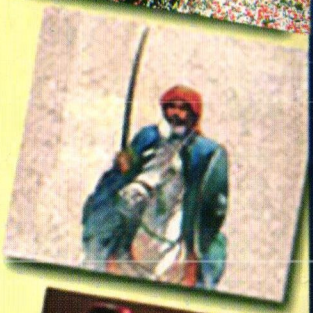
যদি কোনো অমুসলিম তাকে অমুসলিম অথবা কাফের বলাকে গালি মনে করেন তা হলে ইসলাম সম্পর্কে 'তার ভুল ধারণা' ছাড়া এটাকে আর কিছুই বলা যায় না। ইসলাম ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেবার জন্য তাকে ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তখন তিনি বুঝতে পারবেন এটা গালি তো নয়ই বরং যথাযোগ্য পরিভাষা ব্যবহারের জন্য ইসলামকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারবেন না।

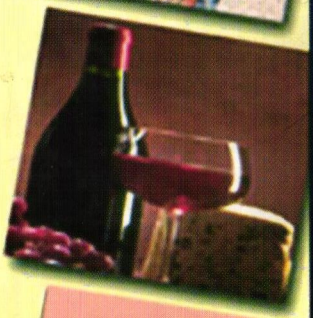
আমীন



- অমুসলিমদের মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই
- শুকর মাংস নিষিদ্ধ
- মদ্য পানের নিষিদ্ধতা
- সাক্ষীদ্বয়ের সমতা
- উত্তরাধিকার
- পরকাল– মৃত্যুর পরবর্তী জীবন
- মুসলমানরা এত ভাগে বিভক্ত কেন
- শুধু ইসলামেরই অনুসরণ করতে হবে কেন
- আকাশ ও পাতালের পার্থক্য
- অমুসলিমদের কাফের বলা









নাকিব
পাবলিকেশন্স